১. সারাংশ ও সারমর্ম

কোনো পদ্য বা গদ্যের মূলভাব বা বক্তব্যকে সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ করার নামই সারমর্ম বা সারাংশ। সাধারণত পদ্যের ভাব সংক্ষেপে প্রকাশকে সারমর্ম এবং গদ্যের বক্তব্য সংক্ষেপে প্রকাশ করাকে সারাংশ বলে। সারমর্ম বা সারাংশ লেখার সময় :

১. যে পাঠটুকুর সারমর্ম বা সারাংশ রচনা করতে হবে, সেটুকু মনোযোগ দিয়ে পড়তে হবে।
২. বাড়তি বিষয় বর্জন করতে হবে। কখনো কোনো পাঠের মূল ভাব উপমা রূ পকের আড়ালে থাকতে পারে, তা বুঝে মূল ভাব লিখতে হবে।
৩. সারাংশ বা সারমর্মে উপমা, রূ পক–এসব বাদ দিয়ে লিখতে হবে।
৪. প্রত্যক্ষ উক্তি বর্জন করে পরোক্ষ উক্তিতে লিখতে হবে।
৫. মূল অংশে উদ্ধৃতি থাকলে প্রয়োজনে সেই উদ্ধৃতির ভাবটুকু উদ্ধৃতি ছাড়া লিখতে হবে।

❑ সারাংশ

[পাঠ্য বই থেকে]

১. সময় ও স্রোত কাহারও অপেক্ষায় বসে থাকে না, চিরকাল চলিতে থাকে। সময়ের নিকট অনুনয় করো, ইহাকে ভয় দেখাও ভ্রুক্ষেপও করিবে না, সময় চলিয়া যাইবে, আর ফিরিবে না। নষ্ট স্বাস্থ্য ও হারানো ধন পুনঃপ্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু সময় একবার গত হইয়া গেলে আর ফিরিয়া আসে না। গত সময়ের জন্য অনুশোচনা করা নিষ্ফল। যতই কাঁদ না গত সময় আর ফিরিয়া আসিবে না।

সারাংশ : সময় চিরবহমান। শত চেষ্টা করলেও সময়ের গতিকে কেউ রুদ্ধ করতে পারে না। চেষ্টা ও শ্রম দিয়ে হয়তো লুপ্ত-স্বাস্থ্য বা ধ্বংস হওয়া ধন-সম্পদ পুনরায় উদ্ধার করা যায়। কিন্তু চলে যাওয়া সময়কে শত চেষ্টায়ও কখনোই ফিরিয়ে আনা যায় না।

২. অপরের জন্য তুমি প্রাণ দাও, আমি তা বলতে চাইনে। অপরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুঃখ তুমি দূর করো। অপরকে একটুখানি সুখ দাও। অপরের সঙ্গে একটুখানি মিষ্টি কথা বল। পথের অসহায় মানুষটির দিকে একটু করুণ চাহনি নিক্ষেপ করো, তাহলেই অনেক হবে। চরিত্রবান, মানবতাসম্পন্ন মানুষ নিজের চেয়ে পরের অভাবে বেশি অধীর হন, পরের দুঃখকে ঢেকে রাখতে গৌরববোধ করেন।

সারাংশ : মানুষের জন্য অনেক বড় কিছু করতে না পারলেও ছোট ছোট কাজের দ্বারাও আমরা মানুষের উপকারে আসতে পারি। সাধ্যমতো সহায়তা দিয়ে অন্যের মনে আশার সঞ্চার করতে পারি। মানবিক অচরণ দিয়ে অসহায় মানুষকে সান্ত্বনা দিতে পারি। এভাবেই মহৎ মানুষেরা তাঁদের মহত্ত্বের পরিচয় দেন।

৩. অভাব আছে বলিয়াই জগৎ বৈচিত্র্যময়। অভাব না থাকিলে জীব সৃষ্টি বৃথা হইতো। অভাব আছে বলিয়াই অভাব পূরণের জন্য এতো উদ্যম, এতো উদ্যোগ। আমাদের সংসার অভাবক্ষেত্র বলিয়াই কর্মক্ষেত্র। অভাব না থাকিলে সকলকেই স্থাণু, স্থবির হইতে হইতো, মনুষ্যজীবন বিড়ম্বনাময় হইতো। মহাজ্ঞানীরা জগৎ হইতে দুঃখ দূর করিবার জন্য ব্যগ্র। কিন্তু জগতে দুঃখ আছে বলিয়াই তো আমরা সেবার সুযোগ পাইয়াছি। সেবা মানবজীবনের ধর্ম। দুঃখ আছে বলিয়াই সে সেবার পাত্র যত্রতত্র সদাকাল ছড়াইয়া রহিয়াছে। যিনি অন্নদান, বস্ত্রদান, জ্ঞানদান, বিদ্যাদান করেন তিনি যেমন জগতের বন্ধু, তেমনি যিনি দুঃখে আমাদের সেবার পাত্রে অজস্র দান করিতেছেন, তিনিও মানবের পরম বন্ধু। দুঃখকে শত্রু মনে করিও না, দুঃখ আমাদের বন্ধু।

সারাংশ : অভাব বা প্রয়োজনের কারণেই মানুষ সৃষ্টি করে। সৃষ্টির প্রেরণাই মানুষের কাজের উৎস। অভাব না থাকলে মানুষ অলস হয়ে যেত। দুঃখ আছে বলেই মহামানবগণ সেবার হাত প্রসারিত করেন। দুঃখে যিনি এগিয়ে আসেন, তিনি মানবের পরমবন্ধু। দুঃখের আগুনে পুড়েই মানুষ খাঁটি সোনা হয়। তাই দুঃখকে শত্রু ভাবা ঠিক নয়।

[অতিরিক্ত অংশ]

৪. আনন্দ প্রকাশ জীবনীশক্তির প্রবলতারই প্রকাশ। আনন্দকে আমরা বুঝি রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শ-গন্ধ ইত্যাদির সাহায্যে, ইন্দ্রিয়সকলের সাহায্যে। মানুষ যখন আনন্দ পায় তখন সে তার মনকে প্রকাশ করতে চায়– নানা রূপে। তাই সৃষ্টি হলো চিত্রশিল্পী, নৃত্যশিল্পী, সংগীতশিল্পী, কবি, সাহিত্যিক। পুরাকালের গুহামানুষ থেকে শুরু করে বর্তমান যুগ পর্যন্ত মানুষ নিজের পাওয়া আনন্দকে সুন্দরকে অন্য মানুষের মধ্যে বিস্তার করতে চেয়েছে। তাই সৃষ্টি হয়েছে নানান আঙ্গিকের শিল্পকলা।

সারাংশ : মানুষের জীবনীশক্তির প্রকাশ ঘটে আনন্দে। তার সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে আনন্দকে সে উপলব্ধি করে। সেই আনন্দানুভূতি সবার কাছে জানাতে চায়। তাই ছবি, গান, কবিতা, নাচ, ভাস্কর্য ইত্যাদি শিল্পকলার মাধ্যমে মানুষ তার আনন্দকে প্রকাশ করে। এই আনন্দ ও সুন্দরের বোধ মানুষের মনকে তৃপ্ত করে।

৫. একজন মানুষ ভালো কি মন্দ আমরা তা বুঝতে পারি তার ব্যবহার দিয়ে। সে ভদ্র কি অভদ্র তাও বুঝতে পারি তার ব্যবহার দিয়ে। ব্যবহার ভালো হলে লোকে তাকে ভালো বলে। তাকে পছন্দ করে। ব্যবহার খারাপ হলে লোকে তাকে খারাপ বলে। তাকে অপছন্দ করে। তার সঙ্গে

মিশতে চায় না। তার সঙ্গে কাজ করতে চায় না। তাকে কাছে ডাকতে চায় না। তোমার ব্যবহার দিয়েই তোমার মনুষ্যত্বের পরিচয়।

সারাংশ : সুন্দর ব্যবহারের মধ্যেই মনুষ্যত্বের পরিচয় নিহিত। মানুষের কথাবার্তা, মনোভাব ও আদব-কায়দার মধ্যে দিয়েই সুন্দর ব্যবহারের প্রকাশ ঘটে। ভালো ব্যবহার দিয়ে সহজেই অপরের ভালোবাসা পাওয়া যায়। সুন্দর স্বভাবের মধ্যেই মানুষের সৌন্দর্য ফুটে ওঠে।

৬. সূর্যের আলোতে রাতের অন্ধকার কেটে যায়। শিৰার আলো আমাদের অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর করে। আমাদের দৃষ্টিতে চারপাশের জগৎ আরো সুন্দর হয়ে ওঠে। আমরা জীবনের নতুন অর্থ খুঁজে পাই; শিৰার আলো পেয়ে আমাদের ভিতরের মানুষটি জেগে ওঠে। আমরা বড় হতে চাই, বড় হওয়ার জন্য চেষ্টা করি। আমরা সুন্দর করে বাঁচতে চাই, বাঁচার মতো বাঁচতে চাই। আর সুন্দর করে বাঁচতে হলে চাই জ্ঞান। সেই জ্ঞানকে কাজেও লাগানো চাই। শিৰার ফলে আমাদের ভিতর যে শক্তি লুকানো থাকে তা ধীরে ধীরে জেগে ওঠে। আমরা মানুষ হয়ে উঠি।

সারাংশ : সূর্যের আলো যেমন অন্ধকার দূর করে, তেমনি শিৰার আলো মনের অন্ধকার দূর করে দেয়। আমাদের প্রত্যেকের ভেতরে শক্তি লুকানো আছে। শিৰা এ শক্তির বিকাশে সাহায্য করে। শিৰার ফলে আমরা জ্ঞান ও দৰতা লাভ করে নিজের শক্তিকে কাজে লাগাই। যথার্থ মানুষ হয়ে উঠি।

৭. ছাত্রজীবন আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনের বীজ বপনের সময়। এ সময় যে যেমন বীজ বপন করবে, ভবিষ্যৎ জীবনে সে সেরূ প ফল ভোগ করবে। এ সময় যদি আমরা নিষ্ঠার সঙ্গে জ্ঞানের অনুশীলন করে যাই তবে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাময় হবে। আর যদি হেলায় সময় কাটিয়ে দিই, তাহলে জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য ব্যর্থ হতে বাধ্য। যে শিৰা জীবন ও জীবিকার পথে কল্যাণকর, যে শিৰা মানুষকে উন্নত চরিত্রের অধিকারী করে, তা-ই সর্বোৎকৃষ্ট শিৰা। ছাত্রদের জীবন গঠনে শিৰকসমাজ গুরবত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। তাঁদের সুষ্ঠু পরিচালনার মধ্যে দিয়ে ছাত্রদের জীবন গঠিত হয় এবং উন্মুক্ত হয় মহত্তর সম্ভাবনার পথ।

সারাংশ : ছাত্রজীবন মানব জীবনের শ্রেষ্ঠতম সময়। ভবিষ্যত জীবনের সাফল্য এ সময়ের কর্মকাণ্ডের ওপরই নির্ভর করে। তাই ছাত্রজীবন থেকেই সুন্দর জীবন গঠনের চর্চা শুরব করতে হবে। ছাত্রদের জ্ঞানার্জন ও চরিত্র গঠনে শিৰকের ভূমিকা সবচেয়ে গুরবত্বপূর্ণ। তাঁদের সঠিক নির্দেশনা পেলে শিৰার্থীর জীবন বিকশিত হয়।

৮. বিদ্যা মানুষের মূল্যবান সম্পদ সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু চরিত্র তদপেৰাও অধিকতর মূল্যবান। অতএব কেবল বিদ্বান বলেই কোনো লোক সমাদর লাভের যোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে না। চরিত্রহীন ব্যক্তি যদি নানা বিদ্যায় আপনার জ্ঞান-ভান্ডার পূর্ণ করেও থাকে তথাপি তার সঙ্গ পরিত্যাগ করাই শ্রেয়। প্রবাদ আছে যে, কোনো কোনো বিষধর সাপের মস্তকে মণি থাকে। মণি মূল্যবান বটে কিন্তু তাই বলে যেমন মণি লাভের নিমিত্ত বিষধর সাপের সাহচর্য বুদ্ধিমানের কাজ নয়, সেরূ প বিদ্যা আদরণীয় বিষয় হলেও বিদ্যা লাভের নিমিত্তে দুর্জন বিদ্বানের নিকট গমন করা বিধেয় নয়। কেননা, দুর্জনের সাহচার্যে আপনার নিষ্কলুষ চরিত্রও কলুষিত হতে পারে এবং এরূ পে মানব-জীবনের অমূল্য সম্পদ নষ্ট হতে পারে।

সারাংশ : চরিত্র মানব-জীবনের অমূল্য সম্পদ। এটি বিদ্যার চেয়েও মূল্যবান। মাথায় মণি থাকলেও সাপ যেমন ভয়ঙ্কর তেমনি চরিত্রহীন ব্যক্তি বিদ্বান হলেও তার সাহচর্য বর্জনীয়। এতে নিজের চরিত্র কলঙ্কিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

৯. মুখে অনেকেই টাকা অতি তুচ্ছ, অর্থ অনর্থের মূল বলে থাকেন। কিন্তু জগৎ এমনি ভয়ানক স্থান যে, টাকা না থাকলে তার স্থান কোথাও নেই– সমাজে নেই, স্বজাতির নিকট নেই, ভ্রাতা-ভগিনীর নিকট নেই, স্ত্রীর নিকট নেই। স্ত্রীর ন্যায় ভালোবাসে–বল তো জগতে কে আর আছে? টাকা না থাকলে অমন অকৃত্রিম ভালোবাসারও আশা নেই, কারো নিকট সম্মান নেই। টাকা না থাকলে রাজায় চিনে না, সাধারণে মান্য করে না, বিপদে জ্ঞান থাকে না। জন্মমাত্র টাকা, জীবনে টাকা, জীবনান্তেও টাকা, জগতে টাকারই খেলা।

সারাংশ : পৃথিবীতে অর্থের চেয়ে মূল্যবান কিছু নেই। যার অর্থ নেই সমাজ সংসারে কোথাও তার মূল্য নেই। জন্ম থেকে মুত্যু পর্যন্ত টাকাই মানুষের ভাগ্যের মূল নিয়ন্তা।

❑ সারমর্ম

[পাঠ্য বই থেকে]

১. ছোট বালুকার কণা, বিন্দু বিন্দু জল
গড়ে তোলে মহাদেশ সাগর অতল।
মুহূর্ত নিমেষ কাল, তুচ্ছ পরিমাণ,
রচে যুগ–যুগান্তর– অনন্ত মহান,
প্রত্যেক সামান্য ত্রুটি ক্ষুদ্র অপরাধ,
ক্রমে টানে পাপ পথে ঘটায় প্রমাদ।
প্রতি করুণার দান, স্নেহপূর্ণ বাণী,
–এ ধরায় স্বর্গ শোভা নিত্য দেয় আনি।

সারমর্ম : পৃথিবীর কোনো কিছুই সামান্য নয়। ছোট ছোট বালুকণা তেমন মহাদেশ তৈরি করে, তেমনি বিন্দু বিন্দু জল মহাসাগরের জন্ম দেয়, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুহূর্তের মাধ্যমে সৃষ্টি হয় যুগ-যুগান্তরের। সামান্য অপরাধের পথ

ধরেই আসে মহাপাপ। সামান্য একটু করুণার ও স্নেহের বাণী এ পৃথিবীতে স্বর্গসুখ এনে দিতে পারে। তাই ছোট হলেই কোনো কিছু তুচ্ছ নয়।

২. কোথায় স্বর্গ, কোথায় নরক? কে বলে তা বহুদূর?
মানুষের মাঝে স্বর্গ নরক– মানুষেতে সুরাসুর–
রিপুর তাড়নে যখন মোদের বিবেক পায়গো লয়,
আত্মগ্লানির নরক অনলে তখনি পুড়িতে হয়।
প্রীতি ও প্রেমের পুণ্য বাঁধনে যবে মিলি পরস্পরে
স্বর্গ আসিয়া দাঁড়ায় তখন আমাদেরই কুড়েঘরে।

সারমর্ম : স্বর্গ বা নরক দূরে কোথাও নয়। স্বর্গ ও নরক মানুষের মাঝেই বিরাজ করে। মানুষ যখন কোনো খারাপ কাজ করে অনুতপ্ত হয়ে যন্ত্রণায় ভোগে, তখন সেটাই নরকযন্ত্রণা। পরস্পরের প্রতি বিভেদ ও স্বার্থের দ্বন্দ্বে মানুষ এই পৃথিবী নরকে পরিণত করে। যখন একে অন্যকে সব বৈরিতা ভুলে বিশুদ্ধভাবে ভালোবাসে তখনই পৃথিবীতে নেমে আসে স্বর্গীয় সুখ।

৩. আসিতেছে শুভদিন,
দিনে দিনে বহু বাড়িয়াছে দেনা, শুধিতে হইবে ঋণ!
হাতুড়ি শাবল গাঁইতি চালায়ে ভাঙিল যারা পাহাড়,
পাহাড়-কাটা সেই পথের দু-পাশে পড়িয়া যাদের হাড়,
তোমারে সেবিতে হইলো যাহারা মজুর, মুটে ও কুলি,
তোমারে বহিতে যারা পবিত্র অঙ্গে লাগাল ধূলি,
তারাই মানুষ, তারাই দেবতা, গাহি তাহাদের গান,
তাদেরি ব্যথিত বক্ষে পা ফেলে আসে নব উত্থান!

সারমর্ম : পৃথিবীর যত উন্নতি সবই শ্রমজীবী মানুষের দান। তাদের নিরলস সেবা ও শ্রমের কারণেই আমরা সুখী জীবন যাপন করি। তাদের এই শ্রমের মূল্য আমরা দেই না, তাদের দুঃখ–বেদনা অনুভব করতে চাই না। প্রকৃতপক্ষে তারাই সভ্যতার অগ্রযাত্রার কারিগর। তাই পরিশ্রমী মানুষরা শ্রদ্ধার পাত্র। তাদের জয়গান করা আমাদের কর্তব্য।

৪. বিপদে মোরে রক্ষা করো, এ নহে মোর প্রার্থনা –
বিপদে আমি না যেন করি ভয়।
দুঃখ-তাপে ব্যথিত চিত্তে নাই–বা দিলে সান্ত্বনা,
দুঃখ যেন করিতে পারি জয়।
সহায় মোর না যদি জুটে, নিজের বল না যেন টুটে,
সংসারেতে ঘটিলে ক্ষতি, লভিলে শুধু বঞ্চনা,
নিজের মনে না যেন মানি ক্ষয়।।

সারমর্ম : কবি সৃষ্টিকর্তার কাছে অনুগ্রহ প্রার্থনা করেন না। কবি কামনা করেন, তার উপর অর্পিত দায়িত্ব যেন তিনি যথাযথভাবে পালন করতে পারেন। বিপদ হতে রক্ষা, দুঃখে সান্ত্বনা, কর্মের ভার লাঘব তাঁর প্রত্যাশিত নয়। কবির কামনা বিপদকে, দুঃখকে, ভয়কে জয় করার মনোবল যেন তাঁর অটুট থাকে।

[অতিরিক্ত অংশ]

৫. এই যে বিটপি-শ্রেণি হেরি সারি সারি–
কি আশ্চর্য শোভাময় যাই বলিহারি!
কেহ বা সরল সাধু-হৃদয় যেমন,
ফল-ভরে নত কেহ গুণীর মতন।
এদের স্বভাব ভালো মানবের চেয়ে,
ইচ্ছা যার দেখ দেখ জ্ঞানচবে চেয়ে।
যখন মানবকুল ধনবান হয়,
তখন তাদের শির সমুন্নত রয়।
কিন্তু ফলশালী হলে এই তরুগণ,
অহংকারে উচ্চশির না করে কখন।
ফলশূন্য হলে সদা থাকে সমুন্নত,
নীচ প্রায় কার ঠাঁই নহে অবনত।

সারমর্ম : গাছ ফলে পরিপূর্ণ হয়ে নত হয়। তাতে তার গৌরব থাকলেও অহংকার থাকে না। কিন্তু মানুষের অর্থ হলেই অহংকার, অর্থ ফুরিয়ে গেলেই মাথা নিচু হয়। গাছ ফলশূন্য হলেও কিন্তু মাথা সোজা করে দাঁড়িয়ে থাকে। নীচ স্বভাবের মানুষের মতো সে কারো কাছে অবনত হয় না।

৬. সাম্যের গান গাই–
আমার চবে পুরুষ-রমণী কোনো ভেদাভেদ নাই।
বিশ্বের যা-কিছু মহান সৃষ্টি চির-কল্যাণকর
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।
বিশ্বে যা-কিছু এল পাপ-তাপ বেদনা অশ্রুবারি
অর্ধেক তার আনিয়াছে নর, অর্ধেক তার নারী।
জগতের যত বড় বড় জয় বড় বড় অভিযান
মাতা ভগ্নী ও বধূদের ত্যাগে হইয়াছে মহীয়ান।
কোন রণে কত খুন দিল নর, লেখা আছে ইতিহাসে,
কত নারী দিল সিঁথির সিঁদুর, লেখা নাই তার পাশে।
কত মাতা দিল হৃদয় উপাড়ি কত বোন দিল সেবা,
বীরের স্মৃতি-স্তম্ভের গায়ে লিখিয়া রেখেছে কেবা?
কোনো কালে একা হয়নি কো জয়ী পুরুষের তরবারি,
প্রেরণা দিয়াছে, শক্তি দিয়াছে বিজয়-লক্ষ্মী নারী।

সারমর্ম : মানবসভ্যতা নির্মাণে নারী ও পুরুষের সমান অবদান রয়েছে। কিন্তু ইতিহাসে পুরুষের কথা যতটা লেখা হয়েছে, নারীর ততটা হয়নি।

নারীকে তার কর্ম-স্বীকৃতি থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। এখন দিন এসেছে সম-অধিকারের। নারী-পুরুষ সবাইকে সুন্দর ও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে।

৭. সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে
সার্থক জনম মা গো, তোমার ভালোবেসে॥
জানি নে তোর ধনরতন আছে কি না রানির মতন,
শুধু জানি আমার অঙ্গ জুড়ায় তোমার ছায়ায় এসে॥
কোন বনেতে জানি নে ফুল গন্ধে এমন করে আকুল,
কোন গগনে ওঠে রে চাঁদ এমন হাসি হেসে॥
আঁখি মেলে তোমার আলো প্রথম আমার চোখ জুড়ালো
ওই আলোতে নয়ন রেখে মুদব নয়ন শেষে॥

সারমর্ম : ধন-রত্নে পূর্ণ না থাকলেও মাতৃভূমি প্রতিটি মানুষের কাছেই প্রিয়। স্বদেশ মানুষের মনে পূর্ণতা এনে দেয়। এজন্যই মানুষ দেশের মাটিতেই শেষ আশ্রয়টুকু চায়।

৮. পরের কারণে স্বার্থ দিয়া বলি
এ জীবন মন সকলি দাও,
তার মতো সুখ কোথাও কি আছে?
আপনার কথা ভুলিয়া যাও।
পরের কারণে মরণেও সুখ;
'সুখ' 'সুখ' করি কেঁদ না আর,
যতই কাঁদিবে, যতই ভাবিবে
ততই বাড়িবে হৃদয় ভার।
আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে
আসে নাই কেহ অবনী 'পরে,
সকলের তরে সকলে আমরা,
প্রত্যেকে মোরা পরের তরে।

সারমর্ম : ত্যাগের মধ্যেই প্রকৃত সুখ নিহিত। অন্যকে বাদ দিয়ে কেউ একা চলতে পারে না। সব মানুষেরই দায়িত্ব অন্যের আনন্দ-বেদনাকে নিজের বলে গ্রহণ করা। পারিস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমেই সুখী সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব।

৯. জগৎ জুড়িয়া এক জাতি আছে
সে জাতির নাম মানুষ জাতি;
এক পৃথিবীর স্তন্যে লালিত
একই রবি শশী মোদের সাথি।
শীতাতপ ক্ষুধা তৃষ্ণার জ্বালা
সবাই আমরা সমান বুঝি,
কচি কাঁচাগুলো ডাঁটো করে তুলি
বাঁচিবার তরে সমান যুঝি।
দোসর খুঁজি ও বাসর বাঁধি গো,
জলে ডুবি, বাঁচি পাইলে ডাঙা,
কালো আর ধলো বাহিরে কেবল
ভিতরে সবারই সমান রাঙা।

সারমর্ম : জাতি, ধর্ম, গাত্রবর্ণ ইত্যাদিতে পার্থক্য থাকলেও এ সকল পরিচয়ের ঊর্ধ্বে হচ্ছে মানুষ জাতি। সব মানুষের অনুভূতিই সমান। মানুষে মানুষে পার্থক্য করা তাই অযৌক্তিক। সকলের অনুভূতিকে মূল্য দিয়ে একসঙ্গে জীবন যাপন করলেই পৃথিবী সুন্দর হবে।

---

২. ভাব-সম্প্রসারণ

কবি-সাহিত্যিকদের লেখায় কখনো কোনো একটি বাক্যে বা কবিতার এক বা একাধিক চরণে গভীর কোনো ভাব নিহিত থাকে। সেই ভাবকে বিস্তারিতভাবে লেখা, বিশ্লেষণ করাকে ভাবসম্প্রসারণ বলে। যে ভাবটি কবিতার চরণে বা বাক্যে প্রচ্ছন্নভাবে থাকে, তাকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করতে হয়। সাধারণত সমাজ বা মানবজীবনের মহৎ কোনো আদর্শ বা বৈশিষ্ট্য, নীতি-নৈতিকতা, প্রেরণামূলক কোনো বিষয় যে পাঠে বা বাক্যে বা চরণে থাকে, তার ভাবসম্প্রসারণ করা হয়। ভাবসম্প্রসারণের ক্ষেত্রে রূপকের আড়ালে বা প্রতীকের ভেতর দিয়ে যে বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়, তাকে যুক্তি, উপমা, উদাহরণ ইত্যাদি সাহায্যে বিশ্লেষণ করতে হয়।

ভাবসম্প্রসারণ করার ক্ষেত্রে যেসব দিক বিশেষভাবে খেয়াল রাখা প্রয়োজন :

১. উদ্ধৃত অংশটুকু মনোযোগ দিয়ে পড়তে হবে।
২. অন্তর্নিহিত ভাবটি বোঝার চেষ্টা করতে হবে।
৩. অন্তর্নিহিত ভাবটি কোনো উপমা-রূপকের আড়ালে নিহিত আছে কি না, তা চিন্তা করতে হবে।

৪. সহজ-সরলভাবে মূল ভাবটিকে ফুটিয়ে তুলতে হবে।

৫. মূল বক্তব্যকে প্রকাশরূ প দেওয়ার জন্য প্রয়োজনে যুক্তি উপস্থাপন করতে হবে।

৬. বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি যেন না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

[পাঠ্য বই থেকে]

১

পিতামাতা গুরুজনে দেবতুল্য জানি,
যতনে মানিয়া চল তাহাদের বাণী।

মূলভাব : বাবা, মা ও অভিভাবকবৃন্দ আমাদের জীবন গঠন ও পরিচালনার জন্য যেসব উপদেশ দেন, সেগুলো মেনে চলা কর্তব্য।

সম্প্রসারিত ভাব : পিতা-মাতা আমাদের জীবন দান করেন এবং অনেক কষ্ট করে লালন পালন করেন। পিতা-মাতার সঙ্গে অন্য গুরুজনরাও আমাদের সুস্থ জীবন বিকাশে সহায়তা করেন এবং অনেক কষ্ট স্বীকার করে আমাদের বড় করে তোলেন। এঁরা সবাই বয়সে, জ্ঞানে বুদ্ধিতে প্রজ্ঞায় আমাদের থেকে অনেক বড়। তাঁরা আমাদের স্নেহ করেন, ভালোবাসেন এবং সর্বদাই মঙ্গল কামনা করেন। অভিজ্ঞতার আলোকে তাঁরা জানেন কী করলে আমাদের ভাল হবে। নবীনতা ও অনভিজ্ঞতার কারণে এই কঠিন ও জটিল পৃথিবীর অনেক কিছুই আমাদের অজানা। সে জন্য পিতা–মাতা গুরুজন ও বিশ্বের মহান ব্যক্তিদের উপদেশ চলার পথে আলোকবর্তিকা হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। আর তা না করতে পারলে জীবনে সফলতা আসবে না। প্রতি মুহূর্তে আমরা হোঁচট খাব। আমরা জানি, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বায়েজিদ বোস্তামি কীভাবে গুরুজনদের আদেশ–উপদেশ পালন করেছেন। আর সে কারণেই তাঁরা আজ সকলের শ্রদ্ধার পাত্রে পরিণত হতে পেরেছেন। তাই পিতা–মাতা, গুরুজন আদর্শস্থানীয়, দেবতুল্য এবং আরাধনাযোগ্য। তাঁদের বাণী অনুসরণ করে নিজের জীবন গড়তে হবে এবং দেশ, জাতি তথা সমগ্র বিশ্বকে শাশ্বত কল্যাণের দিকে এগিয়ে নিতে হবে।

সিদ্ধান্ত : পিতা-মাতা, গুরুজন ও বিশ্বের মহান ব্যক্তিদের উপদেশ মানলে নিজের জীবন সুন্দর ও বিকশিত হবে এবং দেশ ও জাতি উন্নতির শিখরে পৌঁছতে পারবে।

২

আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে
কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে।

মূলভাব : কাজই মানুষের পরিচয়কে ধারণ করে। মুখে বড় বড় কথা না বলে কাজ করলে সভ্যতার বিকাশ সাধন হবে।

সম্প্রসারিত ভাব : আমাদের সমাজে এমন অনেক মানুষ আছে, যারা অনেক কথা বলতে ভালোবাসে কিন্তু কাজের সময় তারা ফাঁকি দেয়। উপরন্তু কাজ শেষে তারা অন্যের সমালোচনা করে। এসব মানুষ সমাজের জন্য ক্ষতিকর। তারা সভ্যতার বিকাশে কোনো ভূমিকা রাখে না বরং এর অগ্রযাত্রায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। কিন্তু নিজে কাজ করলে এবং অন্যের কাজে সহায়তা করলে আমাদের দেশের উন্নতি ত্বরান্বিত হবে। বিশ্বের শৃঙ্খলাবোধ সব দেশেই শ্রমকে, কর্মকে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হয়। মহামানবদের জীবনী পাঠ করলে দেখা যায় তাঁরা কর্ম ও নিষ্ঠা দিয়ে পৃথিবীতে নিজেদের নাম স্বর্ণাক্ষরে খোদাই করে রেখেছেন। যুগ যুগ ধরে তাঁরা সারা বিশ্বে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। এখন থেকে চার দশকেরও অধিক সময় আগে নিল আর্মস্ট্রং, মাইকেল কলিন্স ও এডউইন অলড্রিন –এই তিনজন মানুষ ঐকান্তিক সাধনা, নিরলস শ্রম ও কঠোর অধ্যবসায়ের ফলে চাঁদে অবতরণ করতে পেরেছিলেন। এই দুঃসাহসী কাজের জন্য তাঁরা আজও মানুষের কাছে বরণীয় হয়ে আছেন। এই কাজের মধ্য দিয়ে তাঁরা বিজ্ঞানকে বহুদূর এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। আমাদেরও উচিত তাঁদের পথকে অনুসরণ করে ভালো ও পুণ্যকর্ম করে নিজের, পরিবারের তথা দেশের মুখ উজ্জ্বল করা। আর যারা কাজ না করে বেশি কথা বলে, তাদেরকে মানুষ বাচাল বলে। আর বাচালের সঙ্গ ত্যাগ করা বাঞ্ছনীয়।

সিদ্ধান্ত : আত্মম্ভরিতা পরিত্যাগ করে কাজ ও পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে বিশ্বে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে হবে।

৩

নানান দেশের নানান ভাষা
বিনা স্বদেশী ভাষা মিটে কি আশা?

মূলভাব : মাতৃভাষার মাধ্যমেই মানুষ প্রকৃত রসাস্বাদন করতে পারে এবং এই ভাষায়ই তাদের প্রাণের স্ফূর্তি ঘটে।

সম্প্রসারিত ভাব : পৃথিবীর প্রায় সব জাতিরই নিজস্ব ভাষা আছে এবং এক ভাষা থেকে অন্য ভাষা আলাদা। আমরা ভাষার মাধ্যমে শুধু নিজের মনের ভাবই অন্যের কাছে প্রকাশ করি না, মাতৃভাষার সাহায্যে অন্যের মনের কথা, সাহিত্য–শিল্পের বক্তব্যও নিজের মধ্যে অনুভব করি। নিজের ভাষায় কিছু বোঝা যত সহজ, অন্য ভাষায় তা সম্ভব নয়। বিদেশে গেলে নিজের ভাষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা যায় আরও প্রখরভাবে। তখন নিজের ভাষাভাষি মানুষের জন্য ভেতরে ভেতরে মরুভূমির মতো তৃষিত হয়ে থাকে মানুষ। আমরা বাঙালি, বাঙলা আমাদের ভাষা। বাংলা ভাষায় আমরা কথা বলি, পড়ালেখা করি, গান গাই, ছবি আঁকি, সাহিত্য রচনা করি, হাসি-খেলি, আনন্দ-বেদনা প্রকাশ করি। অন্য ভাষায় তা স্বতঃস্ফূর্তভাবে করা সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, জীবনানন্দ দাশ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ এই ভাষায় সাহিত্য রচনা করে যশস্বী হয়েছেন। মাইকেল মধুসূদন দত্ত জীবনের শুরুতে অন্য ভাষায় সাহিত্য রচনা করে পরে আক্ষেপ করেছেন এবং মাতৃভাষায় সাহিত্যচর্চা করে বিশ্বখ্যাতি লাভ করেছেন। মায়ের মুখের বুলি থেকে শিশু তার নিজের ভাষা আয়ত্ত করা শুরু

করে এবং এই ভাষাতেই তার স্বপ্নগুলো রূ প দেবার চেষ্টা করে, এই ভাষাতেই লেখাপড়া করে এবং জগৎ ও জীবনকে চিনতে শুরু করে। ভিন্ন ভাষাভাষীদের মধ্যে আন্তঃসম্পর্কের জন্য, দেশ-বিদেশের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে নিজেদের সংযুক্ত রাখার জন্য আমাদের অন্য ভাষা বিশেষ করে ইংরেজি ভাষা শিখতে হয়। কিন্তু মাতৃভাষার বুনিয়াদ শক্ত না হলে অন্য ভাষা শেখাও আমাদের জন্য কঠিন হয়ে ওঠে।

সিদ্ধান্ত : স্বদেশের ভাষাকে ভালোবাসতে হবে, এর বিকাশ ও সমৃদ্ধিকে অবাধ করতে হবে এবং বিকৃতিকে রোধ করতে হবে। সুপেয় জল যেমন আকর্ষণীয়, তেমনি স্বদেশের ভাষা সুমিষ্ট।

৪

লাইব্রেরি জাতির সভ্যতা ও উন্নতির মানদণ্ড

মূলভাব : লাইব্রেরি হচ্ছে জ্ঞানের আধার। একটি জাতির রুচির পরিশুদ্ধ, জ্ঞানের গভীরতা ও সভ্যতার অগ্রগমন সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া যায় ঐ জাতির লাইব্রেরির মাধ্যমে।

সম্প্রসারিত ভাব : একটি জাতি বা দেশের সাহিত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান, খেলাধুলা–বিনোদন, সভ্যতা-সংস্কৃতির পরিচয়কে ধারণ করে সেই জাতির সযত্ন তৈরি লাইব্রেরি। কখনো কখনো মানুষের মুখ যেমন ব্যক্তির অন্তর্গত রূ প বা পরিস্থিতিকে নির্দেশ করে, তেমনি লাইব্রেরি জাতির উন্নতি ও অগ্রগতিকে চিহ্নিত করে। লাইব্রেরি জাতির অতীত ও বর্তমানকে এক সুতোয় বেঁধে রাখে এবং ভবিষ্যতের দিকনির্দেশনা দেয়। জ্ঞানান্বেষী ও সত্যসন্ধানী মানুষ লাইব্রেরিতে এসে নিজেকে সমৃদ্ধ করে এবং জাতির সভ্যতার ক্রমোন্নতিতে ভূমিকা রাখে। একটি লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত সাহিত্যগ্রন্থ দেখে সংশ্লিষ্ট জাতির সাহিত্যরুচি উপলব্ধি করা যায়, বিজ্ঞানগ্রন্থ দেখে জাতির বিজ্ঞান–চিন্তা ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা অনুভব করা যায়। তাই গ্রন্থাগার হচ্ছে কালের সাক্ষী। জ্ঞান-বিজ্ঞাসংক্রান্ত যেকোনো প্রয়োজনে লাইব্রেরি পরম বন্ধু এবং অনন্ত উৎস। পৃথিবীতে যত বড় বড় আবিষ্কার হয়েছে, সেগুলোর প্রত্যেকের পেছনে রয়েছে লাইব্রেরির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। তাই অনেক বড় বড় যুদ্ধের পরে দেখা গেছে বিজয়ী শক্তি পরাজিত জাতির লাইব্রেরিকে ধ্বংস করে দিয়েছে। একটি বৃহৎ লাইব্রেরি জাতির সব ধরনের তথ্যই শুধু সংরক্ষণ করে না, দেশের সঠিক উন্নতিতেও প্রভাবকের ভূমিকা পালন করে। লাইব্রেরি মানুষের আনন্দেরও খোরাক যোগায় এবং মানুষের মনকে প্রশান্ত করে। পুস্তকপাঠ মানুষের একটি সৃষ্টিশীল শখ। আর এই শখ পূরণের জন্য লাইব্রেরির প্রয়োজনীয়তা অবশ্যম্ভাবী।

সিদ্ধান্ত : যে জাতি যত উন্নত, সেই দেশের লাইব্রেরি তত সমৃদ্ধ।

৫

পুষ্প আপনার জন্য ফোটে না

মূলভাব : অন্যের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করার মধ্যেই মানুষ্যজীবনের সার্থকতা।

সম্প্রসারিত ভাব : ফুল এই জগতের একটি অনিন্দ্যসুন্দর সৃষ্টি। তার সৌন্দর্য দেখে মানুষ মুগ্ধ হয়। ফুলের গন্ধে মানুষের মন ভরে ওঠে। ফুল থেকে মৌমাছি মধু সংগ্রহ করে, ফুল থেকে তৈরি হয় ফল। সেই ফল মানুষ, পশু-পাখি খেয়ে ক্ষুধা নিবৃত্ত করে এবং দেহ ও মনের বিকাশের জন্য খাদ্য উপাদান গ্রহণ করে। ফুল-ফল থেকে তৈরি হয় অনেক জীবনরক্ষাকারী ওষুধ। ফুলের প্রক্রিয়াজাতের মাধ্যমে তৈরি হয় বিভিন্ন ধরনের সৌরভ। ফুল প্রিয়জনের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট উপহার। যেকোনো আনন্দ–উৎসবকে আরো সুন্দর, আরো আকর্ষণীয় করতে ফুলের কোনো বিকল্প নেই। অন্যের মধ্যে আনন্দ–সঞ্চার ও উপকারের মধ্যেই ফুলের পরিতুষ্টি। রূ প–ঘ্রাণ–লাবণ্য সবই অপরের জন্য বিলিয়ে দিয়ে ফুল ধন্য হয়। মানবসমাজেও এমন কিছু মানুষ আছেন, যারা অন্যের কল্যাণে নিজের সমস্ত অর্জন উৎসর্গ করেন। বিজ্ঞানীদের নব নব আবিষ্কার মানবসভ্যতাকে সমৃদ্ধ করে। সমাজসেবা করে নিজের জীবনকে তুচ্ছ করে সমাজকে উন্নয়নের দিকে নিয়ে যায়। পরার্থপরতা একটি মহৎ গুণ। পরের উপকারে নিজেকে বিসর্জন দিলে এক অতীন্দ্রিয় আনন্দ অনুভব করা যায় এবং নিজের দুঃখ-বেদনাও ভুলে থাকা যায়। স্বার্থ চিন্তা মানুষকে সুখ দিতে পারে না। আত্মকেন্দ্রিকতা মানুষকে ব্রিত করে তোলে।

সিদ্ধান্ত : পুষ্পকে আদর্শ হিসেবে বিবেচনা করে মানবকল্যাণের ব্রত গ্রহণ করলে অনির্বচনীয় তৃপ্তি অনুভব করা সম্ভব।

৬

ইটের পর ইট মধ্যে মানুষ কীট

মূলভাব : নগরসভ্যতার পীড়নে মানুষের জীবন আজ দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। শহরের কৃত্রিমতায় মানুষ ধীরে ধীরে তার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হারিয়ে আজ কীটে পরিণত হয়েছে।

সম্প্রসারিত ভাব : নদী-নালা-খাল-বিল-পাহাড় অরণ্য প্রকৃতির স্বতঃস্ফূর্ত দান। কিন্তু মানুষ সব সময়ই আধিপত্যবাদী। সে প্রকৃতির ওপর ক্ষমতা প্রয়োগ করে ইটের পরে ইট গেঁথে একটার পর একটা দালান তৈরি করে নগর সৃষ্টি করেছে। ফলে ব্যাহত হচ্ছে প্রকৃতির প্রত্যাশিত বিকাশ। হারিয়ে যাচ্ছে ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড়, সুমিষ্ট বায়ুপ্রবাহ, নদীর কলধ্বনি। সেই মমতাময় ও স্বাস্থ্যকর পরিস্থিতিকে দখল করে নিয়েছে এখন বড় বড় অট্টালিকা, বায়ু ও শব্দদূষণ, তীব্র যানজট ও কোলাহল। মানুষ এখানে স্বাভাবিকভাবে শ্বাসগ্রহণ করতে পারে না। শহরে গ্রামের সেই মিলনোন্মুখ সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ নেই, তার বিপরীতে আছে পরস্পরের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা ও স্বার্থের দ্বন্দ্ব। এখানে কেউ কারো সুখ-দুঃখের অংশীদার হয় না। প্রত্যেকেই এখানে বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো বসবাস করে। ফলে আরণ্যক

ভূমিকে ধ্বংস করে মানুষ যতই যন্ত্রসভ্যতার বড়াই করুক না কেন, প্রকৃতপক্ষে মানুষ নগরসভ্যতার যাঁতাকলে পড়ে সে ভেতরে-বাইরে নিঃস্ব হয়ে কীটে পরিণত হচ্ছে। জীবনের স্বাভাবিক স্ফূর্তি বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তাই জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিখরে উঠেও মানুষ আজ ক্লান্ত, অবসন্ন। প্রকৃতি ধ্বংস করার কারণে মানুষ এখন প্রতি মুহূর্তে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ভয়ে শঙ্কিত থাকে। সে আজ মুক্ত পরিবেশের জন্য ব্যতিব্যস্ত। সে একটু নির্মল বাতাস সেবন করতে চায়, বুকভরে নিঃশ্বাস নিতে চায়, প্রাণখুলে কথা বলতে চায়, সহমর্মী হতে চায় একে অন্যের। তাই আবার সে ফিরে পেতে চায় সেই প্রসন্ন, সুন্দর, স্নিগ্ধ গ্রাম।

সিদ্ধান্ত : নগর মানুষের ব্যবহারিক জীবনকে কিছুটা সহজ করলেও তার স্বাচ্ছন্দ্যকে নষ্ট করে দিয়েছে। নগর মানুষের জীবনের স্বাভাবিক বিকাশে অন্তরায় সৃষ্টি করেছে।

৭

বন্যেরা বনে সুন্দর শিশুরা মাতক্রোড়ে

মূলভাব : প্রকৃতি সবকিছুরই একটি স্বাভাবিক সৌন্দর্য আছে এবং সেই সৌন্দর্য যথোপযুক্ত পরিবেশেই স্বতঃস্ফূর্ত ও আকর্ষণীয়।

সম্প্রসারিত ভাব : সৌন্দর্য প্রকৃতির এক মহামূল্যবান দান। কোথায় সেই সৌন্দর্য সবচেয়ে নান্দনিক তা প্রকৃতিই নির্ধারণ করে দেয়। নির্দিষ্ট পরিবেশের ব্যত্যয় ঘটলে সৌন্দর্যের স্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য নিষ্প্রভ হয়ে যায়। বন্য প্রাণীরা বনেই সুন্দর, পাখি মুক্ত আকাশে। ফুল সুন্দর গাছে, মাছ স্বাভাবিক জলে। কিন্তু বন্য প্রাণীকে লোকালয়ে, পাখিকে খাঁচায়, ফুলকে ফুলদানিতে, মাছকে ডাঙায় রাখলে তাদের জীবনের গতি ব্যাহত হয়, সৌন্দর্যের হানি ঘটে, কখনো কখনো জীবননাশের আশঙ্কা তৈরি হয়। এরা প্রত্যাশিত পরিমণ্ডল হারিয়ে নিষ্প্রাণ হয়ে ওঠে। শিশুরও যথার্থ স্থান মায়ের কোল। মায়ের কোলে শিশুকে যতটুকু মানায়, অন্য কোথাও তা সম্ভব নয়। নিজেদের শখ–আহ্লাদ পূরণের জন্য মানুষ কখনো কখনো কৃত্রিম পরিবেশ তৈরি করে বন্য প্রাণী, পাখি, মাছ পোষার চেষ্টা করে, কিছুটা হয়তো সফলও হয়। কিন্তু সেই সব প্রাণীর জীবনের ছন্দ নষ্ট হয়, ব্যাহত হয় যথার্থ বিকাশ। তাই কৃত্রিমতা কখনো গ্রহণযোগ্য নয়। শুধু প্রাণীর আবাস নয়, মানুষের জীবনেও কৃত্রিমতা কাম্য নয়। কখনো কখনো মানুষ মুখোশ পরে তার যথার্থ রূ পকে ঢেকে কৃত্রিম আচরণ করে। ময়ূরের পেখম লাগালেই কাক কখনো ময়ূর হয় না।

সিদ্ধান্ত : যার যেখানে স্থান, তাকে সেখানেই থাকতে দেওয়া উচিত। প্রকৃত রূ পেই সবকিছু সুন্দর, কৃত্রিমতা স্বতঃস্ফূর্ততার অন্তরায়।

৮

সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই

মূলভাব : মানুষে মানুষে অনেক ধরনের বিভেদ-বৈষম্য থাকতে পারে। কিন্তু সবচেয়ে বড় সত্য হচ্ছে আমরা সবাই মানুষ।

সম্প্রসারিত ভাব : সব মানুষ একই সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি এবং সকল সৃষ্টির মধ্যে মানুষ শ্রেষ্ঠ। পৃথিবীর একই জলহাওয়ায় আমরা বেড়ে উঠি। আমাদের সকলের রক্তের রং লাল। তাই মানুষ একে অন্যের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। ভৌগোলিকভাবে আমরা যে যেখানেই থাকি না কেন, অথবা আমরা যে যুগেরই মানুষ হই না কেন, আমাদের একটি পরিচয় আমরা মানুষ। কখনো কখনো স্বার্থসিদ্ধির জন্য আমরা জাত-কুল-ধর্ম-বর্ণের পার্থক্য তৈরি করে শৃঙ্খলাবোধ মানুষকে দূরে ঠেলে দিই, এক দল আরেক দলকে ঘৃণা করি, পশ্চাতে ফেলতে চাই, পরস্পর হানাহানিতে লিপ্ত হই। কিন্তু এগুলো আসলে সাময়িক, প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে আমরা একে অন্যের পরম সুহৃদ। আমাদের উচিত সবাইকে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ রাখা। প্রত্যেককে মানুষ হিসেবে মর্যাদা দেওয়া এবং তার অধিকার সংরক্ষণে একনিষ্ঠ থাকা। মানুষের মধ্যে নারী-পুরুষ, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-দরিদ্র, ব্রাহ্মণ-শূদ্র, আশরাফ-আতরাফ, হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান, কেন্দ্রবাসী-প্রান্তবাসী এমন ভাগাভাগি কখনোই কাম্য হতে পারে না। তাতে মানবতার অবমাননা করা হয়। তাই আধুনিক কালে এক বিশ্ব, এক জাতি চেতনার বিকাশ ঘটছে দ্রুত। মানবজাতির একই একাত্ম-ধারণা প্রতিষ্ঠিত হলে যুগে যুগে, দেশে দেশে মারামারি, যুদ্ধ-বিগ্রহ কমে আসবে। মানুষ সংঘাত-বিদ্বেষ মুক্ত শান্তিপূর্ণ একবিশ্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারবে। সর্বত্র মনুষ্যত্বের জয়গাথা ঘোষিত হবে।

সিদ্ধান্ত : সকল ধর্ম-বর্ণ-গোত্রের মানুষকে মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে, বিশুদ্ধভাবে ভালোবাসতে পারলেই বিশ্বে প্রার্থিত সুখ ও সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হবে।

[অতিরিক্ত অংশ]

৯

বিশ্বের যা কিছু মহান সৃষ্টি চির–কল্যাণকর
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।

মূলভাব : মানব–সভ্যতা বিকাশে নারী ও পুরুষের সমান অবদান রয়েছে। নারী-পুরুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টাতেই গড়ে উঠেছে আমাদের সমাজ, সভ্যতা ও সংস্কৃতি।

সম্প্রসারিত ভাব : সৃষ্টিকর্তা নারী ও পুরুষকে সৃষ্টি করেছেন একে অপরের পরিপূরক হিসেবে। তাই নারী ও পুরুষ চিরকালের সার্থক সঙ্গী। একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। সৃষ্টির আদিমকাল থেকে নারী পুরুষকে জুগিয়েছে প্রেরণা, শক্তি ও সাহস। আর পুরুষ বীরের মতো সব কাজে অর্জন করেছে সাফল্য। আজ পর্যন্ত বিশ্বে যত অভিযান সংঘটিত হয়েছে, তার অন্তরালে নারীর ভূমিকাই মুখ্য। সঙ্গত কারণেই নারী ও পুরুষের কার্যবেত্রে ভিন্নতা আছে। তবুও নারী যেমন পুরুষের উপর নির্ভরশীল, পুরুষও তেমনি নারীর মুখাপেৰী।

মন্তব্য : নারীকে বাদ দিয়ে পুরুষের জীবন অসম্পূর্ণ, অর্থহীন। নারী ও পুরুষের মিলনের মধ্যেই রয়েছে জগতের সমস্ত কল্যাণ। উভয়ের দানে পুষ্ট হয়েছে আমাদের পৃথিবী।

১০

সঙ্গাদোষে লোহা ভাসে।

মূলভাব : প্রত্যেক মানুষই তার জীবন পরিচালনার ৰেত্রে একটি স্বাধীন সত্তা বহন করে। সে একাই তার বিবেককে নিয়ন্ত্রণ করে। তবে এৰেত্রে তার সঙ্গের প্রভাব বিশেষভাবে লৰণীয়।

সম্প্রসারিত ভাব : ভবিষ্যতের সুন্দর বা খারাপের বিষয়টি নির্ভর করে ব্যক্তির ইচ্ছা বা সঙ্গ নির্বাচনের ওপর। যেসব মানুষ উন্নত চরিত্র বা সৎ-স্বভাবের লোকের সঙ্গে মেলামেশা করে, তাদের স্বভাব-চরিত্রও সুন্দর ও বিকশিত হয়ে ওঠে। অন্যদিকে যারা কুসঙ্গে বা কুসংসর্গে থেকে নিজেদের চরিত্রের অধঃপতন ঘটিয়েছে, সমাজে তাদের বিপর্যয় অনিবার্য। তাই মানবজীবনে সঙ্গ নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রকৃতিতেও যেসব বস্তু সুন্দর ও রমণীয়, সেগুলোর সংস্পর্শে যেসব বস্তু থাকে তারাও সুন্দর ও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। খারাপ বস্তুটি সুন্দর বস্তুটির গুণ নিজের মধ্যে ধারণ করে অন্যের কাছে নিজেকে মর্যাদাবান ও গ্রহণযোগ্য করে তোলে।

মন্তব্য : প্রকৃতপৰে, সঙ্গই সৃষ্টিকে মহিমান্বিত করে তোলে। আর এজন্য সঙ্গই হলো সবকিছুর সাফল্য ও বিফলতার চাবিকাঠি।

১১

লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।

মূলভাব : লোভ মানুষের পরম শত্রু। লোভ মানুষকে অন্ধ করে; তার বিবেক বিসর্জন দিয়ে তাকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়।

সম্প্রসারিত ভাব : লোভের বশবর্তী হয়েই মানুষ জীবনের সর্বনাশ ডেকে আনে। মানুষ নিজের ভোগের জন্য যখন কোনো কিছু পাওয়ার প্রবল ইচ্ছা পোষণ করে তাকে লোভ বলে। তখন যা নিজের নয়, যা পাওয়ার অধিকার তার নেই, তা পাওয়ার জন্য মানুষ লোভী হয়ে ওঠে। সে তার ইচ্ছাকে সার্থক করে তুলতে চায়। লোভের মোহে সে সত্য-মিথ্যা, ভালো-মন্দ সব বিসর্জন দেয়। তার ন্যায়-অন্যায় বোধ লোপ পায়। সে পাপের পথে ধাবিত হয়। নিজের স্বার্থের জন্য অন্যের সর্বনাশ করে। এভাবে লোভ মানুষকে পশুতে পরিণত করে। ডেকে আনে মৃত্যুর মতো ভয়াবহ পরিণাম।

মন্তব্য : জীবনকে সুন্দর ও সার্থক করে তোলার জন্য লোভ বর্জন করা উচিত।

১২

জ্ঞানহীন মানুষ পশুর সমান।

মূলভাব : সৃষ্টির অন্যান্য প্রাণীর থেকে মানুষকে আলাদা করেছে তার বিবেক বা জ্ঞান, যা অন্য কোনো প্রাণীর মধ্যে নেই।

সম্প্রসারিত ভাব : প্রতিটি মানুষের মধ্যেই জ্ঞান বা বিবেক সুপ্ত অবস্থায় থাকে। অনুশীলনের মাধ্যমে তাকে জাগিয়ে তুলতে হয়। জ্ঞান মানুষকে যোগ্যতা দান করে। নানা বিদ্যায় পারদর্শী করে তোলে। জ্ঞানের আলোকেই মানুষের জীবন বিকশিত হয়ে ওঠে। তাই মানুষ হিসেবে শ্রেষ্ঠত্ব লাভের জন্য জ্ঞানের সহায়তা অপরিহার্য। অন্য প্রাণীর সঙ্গে মানুষের পার্থক্য এখানেই। জ্ঞানবান মানুষ কখনো খারাপ কাজ করতে পারে না। তার বিবেক তাকে খারাপ আচরণ করতে বাধা দেয়। অপরদিকে জ্ঞানহীন মানুষ পশুর মতো নির্বোধ। পশুর যেমন জ্ঞান নেই। সে ন্যায়-অন্যায় বোঝে না। আপন অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারে না। অজ্ঞান ব্যক্তিরও তেমনি কোনো বিবেক নেই। জ্ঞানের অভাবে তারা আধুনিক জীবনের সম্পূর্ণ স্বাদ উপভোগ করতে পারে না। তাদের জীবনের সঙ্গে পশুর জীবনের কোনো পার্থক্য নেই।

মন্তব্য : জ্ঞানই মানুষ ও পশুর মধ্যে পার্থক্যের সীমারেখা টেনে দেয়। তাই মানুষকে সব সময় জ্ঞানসাধনায় নিয়োজিত থাকা দরকার।

১৩

একতাই বল।

মূলভাব : মানুষ পারিবারিক জীব। পরিবারের প্রত্যেকে একে অপরের উপর নির্ভরশীল। এই পরস্পরের উপর নির্ভরশীলতা থেকে গড়ে উঠেছে মানবসমাজ; মানুষের একতাবোধ। তাই মানবজীবনের অস্তিত্বের সঙ্গে একতার গভীর সম্পর্ক।

সম্প্রসারিত ভাব : মানুষকে সব সময় প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে জীবনযাপন করতে হয়। তার শত্রুর শেষ নেই। প্রতিকূল পরিবেশে শত্রুর মোকাবেলা করার জন্য মানুষের দরকার সংঘবদ্ধ শক্তির। একতাবদ্ধ জীবনে আছে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা। ঐক্যবদ্ধ জাতিকে কোনো শক্তিই পদানত করতে পারে না। একতার কল্যাণ প্রতিফলিত হয় ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনেও। একজনে যে কাজ করতে পারে, দশজনে তার বহুগুণ কাজ করা সম্ভব। এভাবে জাতি একতার গুণে বড় হয় । আজকের বিশ্বে যারা উন্নত ও সমৃদ্ধ জাতি হিসেবে পরিচিত তারা নিজেদের মধ্যে সব ভেদাভেদ ভুলে জাতীয় ঐক্যে উদ্বুদ্ধ হয়েছে। যে জাতি ঐক্যবদ্ধ নয়, সে জাতির উন্নতি অসম্ভব। ব্যক্তির ৰেত্রে বন্ধুবান্ধবহীন নিঃসঙ্গ জীবন যেমন বিভ্রান্তিকর, তেমনি একতাহীন জাতির ধ্বংস অনিবার্য।

মন্তব্য : ব্যক্তিজীবনের স্বার্থে, জাতীয় জীবনের কল্যাণে এবং মানবজাতির মঙ্গলের জন্য মানুষের একতাবদ্ধ থাকা একান্তই অপরিহার্য।

১৪

চরিত্র মানবজীবনের অমূল্য সম্পদ।

মূলভাব : চরিত্র মানবজীবনের মুকুটস্বরূ প। চরিত্রবান ব্যক্তিকে সবাই শ্রদ্ধা করে; চিরত্রহীনকে সকলে ঘৃণা করে।

সম্প্রসারিত ভাব : চারিত্রিক গুণাবলির মধ্য দিয়ে মানুষের জীবনের মহিমা প্রকাশ পায়। চরিত্রবান ব্যক্তি কতগুলো গুণের অধিকারী হন। সততা, বিনয়, উদারতা, নম্রতা, ভদ্রতা, রবচিশীলতা, ন্যায়পরায়ণতা, সত্যবাদীতা, লোভহীনতা, পরোপকারীতা ইত্যাদি গুণ চরিত্রবান ব্যক্তিকে মহত্ত্ব দান করে। এসব গুণ যদি মানুষের মধ্যে না থাকে, তাহলে সে পশুরও অধম বলে বিবেচিত হয়। চরিত্রহীন ব্যক্তির মানুষ হিসেবে কোনো মূল্য নেই। চরিত্রবান ব্যক্তি তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের গুণে সমাজে সমাদৃত হন। অন্যদিকে চরিত্রহীন ব্যক্তিকে কেউ ভালোবাসার দৃষ্টিতে দেখে না, বরং ঘৃণা করে। চরিত্রবান ব্যক্তি জাগতিক মায়া-মোহ-লোভ-লালসার বন্ধনকে ছিন্ন করে লাভ করেন অপরিসীম শ্রদ্ধা ও অফুরন্ত সম্মান।

মন্তব্য : অর্থ-বিত্ত-গাড়ি-বাড়ি প্রভৃতির চেয়ে চরিত্র অনেক বড় সম্পদ। আর এ মর্যাদা অর্থ–মূল্যে নয়, মানবিকতা ও নৈতিক পবিত্রতার মানদণ্ডে বিচার করতে হয়। সকলেরই উচিত চরিত্রবান হওয়ার সাধনা করা।

১৫

পরিশ্রম সৌভাগ্যের প্রসূতি

মূলভাব : সৌভাগ্য নিয়ে পৃথিবীতে কোনো মানুষের জন্ম হয় না। কর্মের মাধ্যমে মানুষ তার ভাগ্য গড়ে তোলে। পরিশ্রমই সৌভাগ্য বয়ে আনে।

সম্প্রসারিত ভাব : যিনি জন্ম দান করেন তিনি প্রসূতি। মা যেমন সন্তানের প্রসূতি, তেমনি পরিশ্রম হলো সৌভাগ্যের প্রসূতি বা উৎস। মানুষকে তার কর্মফল ভোগ করতে হয়। ভালো কাজের ফল ভালো, মন্দ কাজের ফল মন্দ। কোনো কাজই সহজ নয়। আবার কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে কঠিন কাজও সহজ হয়। জীবনে উন্নতি করতে হলে পরিশ্রমের কোনো বিকল্প নেই। পরিশ্রম ছাড়া কেউ কখনো তার ভাগ্যকে গড়ে তুলতে পারেনি। জীবনে অর্থ, বিদ্যা, যশ, প্রতিপত্তি লাভ করতে হলে অবশ্যই পরিশ্রম করতে হবে। ছাত্রজীবনে কঠোর পরিশ্রম করে শিৰালাভ না করলে ভবিষ্যত জীবনে সাফল্য লাভ সম্ভব নয়। পরিশ্রম ছাড়া জাতীয় উন্নতিও লাভ করা যায় না।

মন্তব্য : শ্রমই হলো উন্নতির চাবিকাঠি। যে জাতি পৃথিবীতে যত বেশি পরিশ্রমী, সে জাতি তত উন্নত। ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত পরিশ্রমের মধ্য দিয়েই জাতির অগ্রগতি অর্জন করা যায়।

১৬

শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড

মূলভাব : শিৰাই আলো, নিৰরতা অন্ধকার। শিৰা মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটায়, মানুষের অন্তরের প্রতিভাকে জাগিয়ে তোলে।

সম্প্রসারিত ভাব : জীবন ছাড়া শরীর মূল্যহীন, শিৰা ছাড়া জীবনের কোনো মূল্য নেই। শিৰাহীন মানুষ আর অন্ধের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। যে জাতি শিৰা থেকে বঞ্চিত সে জাতি পঙ্গুত্ব নিয়ে বেঁচে থাকে। তাই নিরৰর জনগোষ্ঠী জাতির জন্য বোঝাস্বরূ প।মেরবদণ্ডহীন মানুষ যেমন সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না, তেমনি শিৰা ছাড়া কোনো জাতি সফল হয় না। যে দেশের লোক যত বেশি শিৰিত, সে দেশ তত বেশি উন্নত। জাতীয় জীবনে উন্নতি ও প্রতিষ্ঠা নির্ভর করে শিৰার ওপর। মানুষের পূর্ণ বিকাশের জন্যই শিৰা প্রয়োজন। শিৰা শুধু ব্যক্তিজীবনে উন্নতি বয়ে আনে না সমাজ জাতি ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সব রকম উন্নতিও সাধন করে। পৃথিবীর প্রতিটি দেশ আজ তাই নিরৰরতার বিরবদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে।

মন্তব্য : উন্নতির একমাত্র চাবিকাঠি শিৰা। শিৰা ব্যক্তিজীবন ও জাতির ভবিষ্যৎ কল্যাণ বয়ে আনে। জাতিকে প্রকৃত শিৰায় শিৰিত করে গড়ে তোলা একান্ত জরবরি।

১৭

ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়

মূলভাব : জীবন কর্মময়। কর্মশক্তির মূলে রয়েছে উৎসাহ–উদ্দীপনা আর প্রবল আগ্রহ। আগ্রহের সঙ্গে নিষ্ঠা যুক্ত থাকলে অসাধ্যকেও সাধ্য করা যায়।

সম্প্রসারিত ভাব : মানুষকে সব বাধা অতিক্রম করতে সাহায্য করে তার ইচ্ছাশক্তি। প্রতিদিনই আমাদের কোনো না কোনো কাজ করতে হয়। পৃথিবীতে কোনো কাজই বিনা বাধায় করা যায় না। সব কাজেই কিছু না কিছু সুবিধা–অসুবিধা ও বাধা–বিপত্তি থাকে। সেই অসুবিধা ও বাধা–বিপত্তি অতিক্রম করতে পারলেই সাফল্য আসে। এজন্য প্রয়োজন প্রবল ইচ্ছা। ইচ্ছা থাকলে কোনো কাজ আটকে থাকে না। ইচ্ছাই সকল কর্মের প্রেরণা। ইচ্ছাই মানুষকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। দৃঢ় ইচ্ছার কাছে সকল বাধা হার মানে। প্রবল ইচ্ছা নিয়ে কোনো কাজ করলে অতি কঠিন কাজও শেষ করা যায়। পৃথিবীর মহান ব্যক্তিরা এভাবেই সব ধরনের বিপত্তি অতিক্রম করে লৰ্যে পৌঁছেছেন। সম্রাট নেপোলিয়ান তাঁর সেনাবাহিনীসহ আল্পস পর্বতের কাছে গিয়ে অসীম উৎসাহে বলে ওঠেন : 'আমার বিজয় অভিযানের মুখে আল্পস পর্বত থাকবে না।' আত্মশক্তি ও ইচ্ছাশক্তির বলে তিনি আল্পস পার হতে পেরেছিলেন।

মন্তব্য : মানুষের সকল কাজের মূল হলো ইচ্ছাশক্তি। ইচ্ছাই মানুষকে সাফল্যের দ্বারে পৌঁছে দেয়।

১৮

আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে
আসে নাই কেহ অবনী পরে,
সকলের তরে সকলে আমরা

প্রত্যেকে মোরা পরের তরে।

মূলভাব : মানুষ সামাজিক জীব। সমাজে পরস্পর সহযোগিতার মাধ্যমে তাকে বেঁচে থাকতে হয়।

সম্প্রসারিত ভাব : সমাজবিচ্ছিন্ন মানুষের জীবন অর্থহীন। কারণ, সমাজে প্রতিটি মানুষ একে অন্যের ওপর নির্ভরশীল। যে ব্যক্তি কেবল নিজের কথা ভাবে, সমাজের কথা ভাবে না, সে স্বার্থপর ও আত্মকেন্দ্রিক। সমাজবিচ্ছিন্ন মানুষ কখনোই সুখী হয় না। যারা নিজের কথা না ভেবে সমাজের মঙ্গল ও কল্যাণের জন্য নিজেদের জীবন বিলিয়ে দেয় তারাই প্রকৃত মানুষ। অন্যের সুখের জন্য যারা ত্যাগ স্বীকার করে, তাদের মতো সুখী আর কেউ নেই। সমাজে এ রকম মানুষেরাই চিরস্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে আছেন। একে অন্যের সাহায্যে এগিয়ে আসাই প্রকৃত মানবধর্ম। আজকের এই সভ্যতা গড়ে ওঠার পেছনে কাজ করেছে মানুষের শুভবুদ্ধি ও অন্যের কল্যাণ করার ইচ্ছা।

মন্তব্য : ত্যাগের মাঝেই জীবনের সার্থকতা নিহিত, ভোগের মাঝে নয়।

৩. অনুধাবন শক্তি ও অনুচ্ছেদ

❑ অনুধাবন শক্তি

লিখিত কোনো বিষয় সাধারণভাবে আমরা অনেকেই পড়ে থাকি। কিন্তু সেই অংশটুকু পড়ে তার মূলভাব বুঝতে পারাকে বলে অনুধাবন দক্ষতা। একটি পাঠে কিছু শব্দ থাকে, কিছু নতুন বিষয় থাকতে পারে, যার অর্থ বা ধারণা জানা না থাকলে পাঠটির পূর্ণ ধারণা লাভ সহজ হয় না। তাই একটি পাঠ সম্পূর্ণরূ পে বুঝতে হলে পাঠসংশ্লিষ্ট কিছু বিষয়ও জানতে, বুঝতে হয়। আবার তা কেবল মুখস্থ করলে সেটি বেশি দিন মনে নাও থাকতে পারে। সেই জানা জ্ঞান অন্য কোনো পাঠের সাথে বা জ্ঞানের সাথে মেলাতে পারার ক্ষমতাও থাকতে হয়। এভাবেই অনুধাবন দক্ষতা পরিপূর্ণভাবে অর্জিত হয়।

[পাঠ্য বই থেকে]

১. অনুধাবন শক্তি পরীক্ষা :

পৃথিবী, নির্ঝর, অর্ক, মৃত্তিকা, শ্রাবণী, সৃষ্টি ও অত্রি শীতের ছুটিতে চরকাবায় বেড়াতে গিয়েছে। ওরা ভাই-বোন মিলে এলাকাটির সবকিছু ঘুরে ঘুরে দেখল। ওখানে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, একটি উচ্চ বিদ্যালয় ও একটি বাজার আছে। এলাকার অধিকাংশ জনগণই শিক্ষিত। কৃষিজীবী, চাকরিজীবী, ব্যবসায়ীসহ নানা পেশার মানুষ সেখানে বসবাস করেন। বেশকিছু লোক জীবিকার তাগিদে মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরোপসহ নানা দেশে চাকরি নিয়ে গেছেন। এলাকার জনগণ মোটামুটি সচ্ছল। বৈদেশিক অর্থ লেনদেনের জন্য ওখানে বেশকিছু ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কোনো কোনো বাড়িতে ফুলের বাগানও রয়েছে। চরকাবা এলাকাটি বাংলাদেশের একটি আদর্শ গ্রামীণ এলাকা।

কর্ম-অনুশীলন :

ক. 'মৃত্তিকা' শব্দের অর্থ কী?

খ. কৃষিজীবী কারা?

গ. জীবিকা বলতে কী বুঝ?

ঘ. নানান পেশার মানুষ বলতে কী বুঝায়?

ঙ. আদর্শ গ্রামের একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।

উত্তর :

ক. 'মৃত্তিকা' শব্দের অর্থ মাটি।

খ. কৃষি কাজ করার মাধ্যমে যারা জীবিকা অর্জন করে তারাই কৃষিজীবী।

গ. জীবন ধারণের জন্য আমরা যে কাজের সাথে জড়িত থাকি তা-ই আমাদের জীবিকা।

মানুষের জীবন ধারনের জন্য অর্থ উপার্জন করতে হয়। এজন্য মানুষ নানা ধরনের কাজ করে। অর্থাৎ বিভিন্ন পেশায় কর্মরত থাকে। এভাবে যে কাজ বা পেশায় নিয়োজিত থেকে আমরা পারিশ্রমিক অর্জন করি সেই কাজ বা পেশাই জীবিকা হিসেবে পরিচিত।

ঘ. সব মানুষের জীবিকা অর্জনের পদ্ধতি এক নয়। একেক জন একেক ধরনের কাজে নিয়োজিত থাকেন। কেউ চাকরি করেন, কেউ কৃষিকাজ করেন, কেউ মাছ ধরেন কেউ শিৰকতা করেন, কেউ বা ব্যবসা করেন। নানা পেশার মানুষ বলতে এই বৈচিত্রপূর্ণ কাজে নিয়োজিত মানুষদেরই বোঝানো যায়।

ঙ. একটি আদর্শ গ্রাম বলতে আমরা বুঝি সেই গ্রামকে যেখানে জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থার সুন্দর সমন্বয় থাকে।

একটি আদর্শ গ্রামে প্রয়োজনীয় শিৰা প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি দরকারি ব্যবসা, ধর্মীয় ও অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহ সঠিক পরিমাণে থাকে। জনগণের কর্মসংস্থানের সুযোগ নিশ্চিত হয়। মানুষের মাঝে শান্তি–শৃঙ্খলা বিদ্যমান থাকে।

[অতিরিক্ত অংশ]

২. নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ো এবং অনুধাবন করে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

সৌভাগ্য আকাশ থেকে পড়ে না। জীবনে সৌভাগ্য অর্জনের জন্য প্রচুর পরিশ্রম ও নিরন্তর সাধনার দরকার হয়। সব মানুষের মধ্যে সুপ্ত প্রতিভা আছে। পরিশ্রমের দ্বারা সেই সুপ্ত প্রতিভাকে জাগিয়ে তুলতে হয়। যে মানুষ কর্মকে জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছে, জীবন সংগ্রামে তারই জয় হয়েছে। কর্মের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তি জীবনে

সফল সৈনিক হতে পারে। কর্মহীন ব্যক্তি সমাজের বোঝাস্বরূ প। অন্যদিকে, শ্রমশীলতাই মানব জীবনের সৌভাগ্যের চাবিকাঠি। আমাদের জীবনে উন্নতি করতে হলে, জীবনে সুখী হতে হলে পরিশ্রমের বিকল্প নেই।

i. 'সৌভাগ্য' শব্দের বিপরীত শব্দ কী? ১

ii. সৌভাগ্য অর্জনের জন্য কী করতে হয়? ১

iii. কে সমাজের বোঝা? ১

iv. জীবন সংগ্রামে জয়ী হতে হলে কিসের প্রয়োজন? ২

উত্তর :

i. 'সৌভাগ্য' শব্দের বিপরীত শব্দ হচ্ছে 'দুর্ভাগ্য'।

ii. সৌভাগ্য অর্জনের জন্য প্রচুর পরিশ্রম ও নিরন্তর সাধনা করতে হয়।

iii. কর্মহীন ব্যক্তি সমাজের বোঝা।

iv. জীবন সংগ্রামে জয়ী হতে হলে কর্মকাকে জীবনের মূল লব্য হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। পরিশ্রমই উন্নতির মূল চাবিকাঠি। কর্মের প্রতি একনিষ্ঠ ব্যক্তিগণই জীবন সংগ্রামে সফল হয়েছেন।

৩. নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ো এবং অনুধাবন করে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

বাংলা সনের প্রথম মাসের নাম বৈশাখ। পয়লা বৈশাখ বাঙালির নববর্ষ। নববর্ষ সকল দেশের, সকল জাতিরই আনন্দ উৎসবের দিন। শুধু আনন্দ উচ্ছ্বাসই না, সকল মানুষের জন্য কল্যাণ কামনারও দিন। আমরাও সুখ-শান্তি-সমৃদ্ধি ও কল্যাণের প্রত্যাশা নিয়েই মহাধুমধামের সঙ্গে আমাদের নববর্ষ উদ্‌যাপন করি। একে অন্যকে বলি শুভ নববর্ষ।

i. 'আনন্দ' শব্দের বিপরীত শব্দ কী? ১

ii. 'উচ্ছ্বাস' শব্দটির সন্ধি বিচ্ছেদ করো। ১

iii. বাংলা সনের প্রবর্তক কে? ১

iv. বাংলা নববর্ষের মতো সার্বজনীন আরো একটি উৎসবের সংবিপ্ত পরিচয় দাও। ২

উত্তর :

i. 'আনন্দ' শব্দের বিপরীত শব্দ হলো 'কষ্ট'।

ii. 'উচ্ছ্বাস' শব্দটির সন্ধি বিচ্ছেদ হলো– উৎ + শ্বাস।

iii. বাংলা নববর্ষের ইতিহাস এখনো সুস্পষ্টভাবে জানা সম্ভব হয় নি। তবে অধিকাংশ ঐতিহাসিক ও পন্ডিতের মতে মুঘল সম্রাট বাদশাহ আকবর বাংলা সন চালু করেন।

iv. বাংলা নববর্ষের মতো আরও একটি সার্বজনীন উৎসব হলো বিজয় উৎসব।

আমাদের মহান বিজয় দিবস অর্থাৎ ১৬ই ডিসেম্বর আমরা এই উৎসব করে থাকি। এদিন সারা দেশ লাল সবুজে সেজে ওঠে। সর্বস্তরের বাঙালি এই উৎসবে আনন্দের সাথে অংশ নেয়।

৪. নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ো এবং অনুধাবন করে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

আমাদের দেশের উন্নতির প্রধান অন্তরায় আমাদের জনসংখ্যা সমস্যা। এই জনসংখ্যা সমস্যাকে জনশক্তি হিসেবে গড়ে তুলতে পারলে দেশের উন্নতি সম্ভব। তাদেরকে প্রয়োজনীয় কর্মক্ষেত্রে কাজে লাগিয়ে দিতে হবে। কারিগরি শিক্ষাকে গুরুত্ব দিতে হবে। জনগণ কায়িক পরিশ্রমের মর্যাদা পেলে তারা কায়িক পরিশ্রমের দিকে আগ্রহী হবে। পরিশ্রমী জনগণ দ্বারা দেশের ও জাতির উন্নয়ন সম্ভব।

i. 'উন্নতি' শব্দের বিপরীত শব্দ কী? ১

ii. কারিগরি শিক্ষা বলতে কী বোঝ? ২

iii. 'জাতি'–এর দুটি প্রতিশব্দ লেখো। ১

iv. 'জনসংখ্যা সমস্যা' আমাদের দেশের উন্নতির প্রধান অন্তরায়– বিশেরষণ করো। ২

উত্তর :

i. 'উন্নতি' শব্দের বিপরীত শব্দ হলো অবনতি।

ii. কারিগরি শিক্ষা বলতে বোঝায় হাতে–কলমে লাভ করা বিশেষ শিক্ষা।

একজন ব্যক্তি তার আত্মপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যখন বিশেষ কোনো কর্মে প্রশিক্ষিত হন তখন সেই শিক্ষাকে কারিগরি শিক্ষা বলে। এই শিক্ষা হাতে-কলমে গ্রহণ করা হয় এবং শিক্ষা শেষেই জীবিকা অর্জনের যোগ্যতা অর্জিত হয়।

iii. 'জাতি' শব্দের দুটি প্রতিশব্দ হলো– বর্ণ এবং শ্রেণী।

iv. জনসংখ্যা সমস্যা থেকে তৈরি হচ্ছে আরও নানা ধরনের সমস্যা যা জাতির উন্নতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

জনসংখ্যার ঘনত্বের দিক থেকে বাংলাদেশ পৃথিবীতে অন্যতম। এই বিপুল জনগোষ্ঠীর চাহিদা পূরণের জন্য দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো ও প্রাকৃতিক সম্পদের পরিমাণ মোটেই যথেষ্ট নয়। ফলে দেশে বাড়ছে বেকার সমস্যা, অপরাধ প্রবণতা ইত্যাদি। আর এগুলো আমাদের উন্নতির ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করেছে।

❑ অনুচ্ছেদ রচনা

বাক্য মনের ভাব প্রকাশের মাধ্যম। কিন্তু সব সময় একটি বাক্যের মাধ্যমে মনের সম্পূর্ণ ভাব প্রকাশ করা সম্ভব হয় না। এজন্য প্রয়োজন একাধিক বাক্যের। মনের ভাব সম্পূর্ণরূ পে প্রকাশ করার জন্য পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত বাক্যের সমষ্টিই অনুচ্ছেদ। অনুচ্ছেদে কোনো বিষয়ের একটি দিকের

আলোচনা করা হয় এবং একটি মাত্র ভাব প্রকাশ পায়। অনুচ্ছেদ রচনার ৰেত্রে কয়েকটি দিকে লৰ রাখা প্রয়োজন। যেমন–

ক) একটি অনুচ্ছেদের মধ্যে একটি মাত্র ভাব প্রকাশ করতে হবে। অতিরিক্ত কোনো কথা লেখা যাবে না।

খ) সুশৃঙ্খলভাবে সাজানো বাক্যের মাধ্যমে বিষয় ও ভাব প্রকাশ করতে হবে।

গ) অনুচ্ছেদটি খুব বেশি বড় করা যাবে না।

ঘ) একই কথার পুনরাবৃত্তি যাতে না ঘটে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

ঙ) যে বিষয়ে অনুচ্ছেদটি রচনা করা হবে তার গুরবত্বপূর্ণ দিকটি সহজ–সরল ভাষায় সুন্দরভাবে তুলে ধরতে হবে।

১ বাংলা নববর্ষ

নববর্ষ সকল দেশের সকল জাতিরই আনন্দ উচ্ছ্বাস ও মঙ্গল কামনার দিন। বাংলাদেশেও পয়লা বৈশাখে সকলের কল্যাণ প্রত্যাশা করে মহা ধুমধামের সাথে নববর্ষ উদ্‌যাপিত হয়। প্রবল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে সকল বাঙালি এই উৎসব পালন করে থাকে। বাঙালির জাতিসত্ত্বা বিনির্মাণে এবং স্বাধীনতা অর্জনে নববর্ষের তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সম্রাট আকবরের সময় বাংলা সনের গণনা শুরব হয় বলে ধরণা করা হয়। জমিদার ও নবাবেরা নববর্ষে পূণ্যাহ আয়োজন করতেন। পরবর্তিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিবার বিশেষ গুরবত্ব দিয়ে নববর্ষ পালন করায় সে আয়োজন দেশময় ছড়িয়ে পড়ে। নববর্ষে হালখাতা, বৈশাখী মেলা, ঘোড়দৌড় এবং বিভিন্ন লোকমেলার আয়োজন করে সাধারণ মানুষ। সংস্কৃতি সংগঠন ছায়ানট নববর্ষে রমনার বটমূলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারবকলা বিভাগ আয়োজন করে মঙ্গল শোভাযাত্রা। এছাড়াও নানা বর্ণিল আয়োজনে দিনটিকে বরণ করা হয়। ছেলেরা পাজামা–পাঞ্জাবি এবং মেয়েরা নানা রঙের শাড়ি পড়ে উৎসবে মাতোয়ারা হয়। এই দিনে প্রত্যেক বাঙালি নিজের, বন্ধুর, পরিবার ও দেশের সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করে।

২ ছাত্রজীবন

ছাত্রজীবন মানবজীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সময়। বিদ্যাশিৰার সূচনা থেকে মানুষ জীবনের যে সময়টুকু স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় বা অন্য কোনো শিৰালয়ে অতিবাহিত করে, তা–ই ছাত্রজীবন। 'ছাত্রনং অধ্যানং তপ' অর্থাৎ অধ্যয়নই হচ্ছে ছাত্রজীবনের একমাত্র তপস্যা। এই বিষয়টি প্রত্যেক ছাত্রকে স্পষ্টভাবে মনে রাখতে হবে। ছাত্ররাই দেশের ভবিষ্যৎ কর্ণধার ও জাতির আশা–ভরসার প্রতীক। দেশ ও জাতিকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার গুরবদায়িত্ব ভবিষ্যতে ছাত্রদের ওপরই বর্তায়। সে গুরবদায়িত্ব সার্থকতার সাথে বহন করার জন্যে তাদেরকে উপযুক্ত হতে হবে। আধুনিক বিশ্বের নানান খবরাখবর সংগ্রহ এবং তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করা একজন ছাত্রের জন্যে অত্যন্ত জরবরি। পড়াশোনার পাশাপাশি বিভিন্ন সৃজনশীল কর্মকাণ্ডে ছাত্রদের অংশগ্রহণ থাকা প্রয়োজন। কর্মজীবনে প্রবেশের সোপান হচ্ছে ছাত্রজীবন। ছাত্রজীবনের সফলতা ও ব্যর্থতার ওপর কর্মজীবন অনেকাংশে নির্ভরশীল। এ সময় থেকেই জীবন সংগ্রামের জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হয়। একজন ছাত্রকে অবশ্যই কুসংসর্গ ত্যাগ করে সততা, সংযম ও পরিশ্রমের সমন্বয়ে আদর্শ মানুষ হওয়ার চেষ্টা করতে হবে।

৩ সততা

সততা মানবচরিত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ একটি গুণ। সর্বদা সত্য কথা বলা, সৎপথে চলা এবং কোনো অন্যায় কাজে লিপ্ত না হওয়ার নামই সততা। একথায় সত্যের অনুসারী মানুষের সৎ থাকার গুণকে সততা বলা হয়। এই গুণ অর্জনের চেষ্টা ও চর্চা একজন মানুষকে পৌঁছে দিতে পারে মর্যাদা ও গৌরবের আসনে। নিষ্ঠার সঙ্গে নিরলস অনুশীলনের মাধ্যমে এই গুণ অর্জন করা যায়। আর এই গুণ যিনি অর্জন করতে পারেন তিনিই সমাজে আদর্শ ব্যক্তি হিসেবে পরিচিতি লাভ করে থাকেন। সততাকে তাই মানবচরিত্রের অলঙ্কার বলা হয়। সততার সুফল শত ধারায় বিকশিত। জীবনকে সুন্দর সফল ও সার্থক করার জন্য সৎ থাকার অভ্যাস করতে হয়। সৎগুণসম্পন্ন মানুষ কখনোই অন্যায় ও অবৈধ কাজে লিপ্ত থাকতে পারে না। সৎ লোক মাত্রই চরিত্রবান ও মহৎ হয়ে থাকে। তাই সে সবার বিশ্বাসভাজন ও শ্রদ্ধেয় হয়। সততা মানুষের নৈতিকতাকে সমুন্নত করে। সৎ ব্যক্তি কখনোই অন্যায়ের কাছে মাথা নত করে না। একটি সমৃদ্ধ ও আদর্শ জীবন গড়ার জন্য সততার বিকল্প নেই। শিৰার্থীদের উচিত ছাত্রজীবন থেকেই সৎ গুণগুলো অনুশীলন করা। তাহলেই তারা পরিবার ও জাতির মুখ উজ্জ্বল করতে পারবে।

৪ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

একুশে ফেব্রবয়ারি আমাদের জাতীয় জীবনের এক উজ্জ্বলতম দিন। ১৯৫২ সালের এ দিনে মাতৃভাষার মর্যাদা রৰায় রাজপথে প্রাণ দিয়েছিল বাংলার দামাল ছেলেরা। তাদের সেই আত্মত্যাগের বিনিময়েই নিশ্চিত হয়েছে মায়ের ভাষা বাংলায় কথা বলার অবারিত অধিকার। সেই ঐতিহাসিক ভাষা শহিদদিবস ২১শে ফেব্রবয়ারি 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেব স্বীকৃতি লাভ করেছে। কানাডা প্রবাসী বাঙালিদের সংগঠন 'মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ অব দ্যা ওয়ার্ল্ড' প্রথম ২১শে ফেব্রবয়ারির আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির উদ্যোগ গ্রহণ করে। কিন্তু সেই প্রচেষ্টা আলোর মুখ দেখেনি। পরবর্তীকালে বাংলাদেশ সরকারের মাধ্যমে বিষয়টি জাতিসংঘে উত্থাপিত হয়। বিশ্বের ২৭টি দেশ এ প্রস্তাবকে সমর্থন জানায়। ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর ইউনেস্কোর ২১ তম অধিবেশনে ২১শে ফেব্রবয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে পালনের স্বীকৃতি দেওয়া হয়। বর্তমানে বিশ্বের সকল দেশ এই দিনটিকে শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করছে। বাংলাদেশের শহিদদের মহান ত্যাগ এভাবে

বিশ্ববাসীর স্বীকৃতিলাভ করেছে। বাংলাদেশ ও বাঙালি জাতির জন্য এটি একটি বিরল গৌরব। বাংলা ভাষা শহিদ ভাইদের জীবনের বিনিময়ে আমরা অর্জন করেছি। তাই এই ভাষাকে আমরা শ্রদ্ধা করব, শুদ্ধভাবে এ ভাষার চর্চা করব। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে এটিই হোক সকলের শপথ।

৫ সকাল বেলা

সকাল বেলা আমার সবচেয়ে প্রিয় সময়। এ সময়ের শান্ত ও স্নিগ্ধ পরিবেশ আমাকে খুব আকর্ষণ করে। আমি খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে হাতমুখ ধুয়ে আমার বাড়ির পাশের নদীর তীরে হাঁটতে যাই। সেখান থেকে সকালের সূর্যোদয় দেখতে খুবই সুন্দর লাগে। সকালের শীতল বাতাস আমার দেহমন জুড়িয়ে দেয়। নানা রকম পাখির কলকাকলিতে পরিবেশটা মুখরিত হয়ে ওঠে। এ সময় কৃষকেরা গরব নিয়ে হাল চাষ করতে বের হয়। গ্রামের মসজিদে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে সমস্বরে কোরআন তেলাওয়াত করে। কিছুৰণ হাঁটাহাঁটি করে আমি বাড়ি ফিরে নাস্তা করে পড়তে বসি। তারপর বন্ধুদের সাথে মিলে স্কুলে যাই। ছুটির দিনে সকাল বেলা আমি বাবাকে নানা কাজে সাহায্য করি। সকাল বেলা তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠলে আমার সারাটা দিন খুব ভালো কাটে।

৬ আমার মা

পৃথিবীতে মা আমাদের সবচেয়ে আপনজন। অনেক কষ্ট স্বীকার করে তিনি আমাদের জন্ম দেন। অনেক স্নেহ-মমতায় বড় করে তোলেন। আমার কাছে আমার মা সবচেয়ে প্রিয়। মাকে ছাড়া আমি একটি মুহূর্তের কথাও ভাবতে পারি না। মা আমাকে অনেক ভালোবাসেন। সব সময় আমাকে নিয়ে ভাবেন। আমি দুপুরে স্কুল থেকে বা সন্ধ্যায় মাঠ থেকে ফিরতে দেরি করলে মা দুশ্চিন্তায় পড়ে যান। আমাকে না খাইয়ে কখনো খান না। আমার অসুখ হলে মা আমার যত্ন করেন। রাত জেগে আমার পাশে বসে থাকেন। মা-ই আমার শ্রেষ্ঠ বন্ধু। আমি মায়ের কাছে কোনো কিছুই গোপন করি না। মা আমাকের কখনোই বকেন না। ভালো পথে চলার জন্য সব সময় পরামর্শ দেন। মা আমার সেরা শিৰক। আমার পড়া তৈরিতে তিনি সাহায্য করেন। কঠিন বিষয়গুলো মা সহজেই বুঝিয়ে দেন। আমি মাকে কখনোই কষ্ট দিই না। সবসময় মায়ের কথামতো চলতে চেষ্টা করি। বাড়ির ছোটোখাটো কাজে মাজে সাহায্য করি। আমার মাকে আমি অনেক শ্রদ্ধা করি ও ভালোবাসি।

৭ পরিবেশ দূষণ

মানুষসহ অন্যান্য জীবজন্তু পরিবেশ ও প্রকৃতির অংশ। প্রকৃতির দানেই মানুষ নানা অঙ্গিকে নিজের জীবনকে সাজিয়ে তুলেছে। অথচ অবিবেচক মানুষদের কারণেই পরিবেশ আজ ক্রমান্বয়ে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। বর্তমান সময়ে পরিবেশ দূষণের পেছনে মানুষের ভূমিকাই সবচেয়ে বেশি। জনসংখ্যার বিস্ফোরণের কারণে প্রাকৃতিক সম্পদ- বায়ু, পানি, মাটির ওপর প্রচণ্ড চাপ পড়ছে। বনজ সম্পদ ধ্বংসের রীতিমতো উৎসব চলছে বিশ্বজুড়ে। ফলে পরিবেশ দূষণের মাত্রা দিন দিন বেড়েই চলেছে। বাতাসে ধুলোবালি, কলকারখানা ও যানবাহনের ধোঁয়া, কীটনাশক ইত্যাদির উপস্থিতি বাড়ছে আশংকাজনকভাবে। কলকারখানার বর্জ্য, কীটনাশক ইত্যাদি পানিকে করে তুলেছে বিষাক্ত। হাজারো রকমের উৎকট শব্দের কারণে শব্দ দূষণ ঘটছে। নষ্ট হচ্ছে মনের শান্তি। ৰতিকর রাসায়নিক ও যত্রতত্র আবর্জনা ফেলায় দূষিত হচ্ছে মাটি। এভাবে দূষিত হতে থাকলে এক সময় পরিবেশের ভারসাম্য সম্পূর্ণরূ পে নষ্ট হয়ে যাবে। ফলে এই বিশ্ব জীবের বসবাসের অনুপযোগী হয়ে উঠবে। অর্থাৎ পৃথিবীতে প্রাণের অস্তিত্ব আজ মারাত্মক হুমকির মুখে। তাই পরিবেশ দূষণ যাতে না ঘটে সে ব্যাপারে সবারই ভূমিকা রাখা উচিত। সকলের সচেতনতাই আমাদের পরিবেশকে সুস্থ ও সুন্দর করে তুলতে পারে।

---

৪. পত্র রচনা

❑ **চিঠি বা পত্র :**

চিঠির আভিধানিক অর্থ হলো স্মারক বা চিহ্ন। তবে ব্যবহারিক অর্থে চিঠি বা পত্র লিখন বলতে বোঝায়, একের মনের ভাব বা বক্তব্যকে লিখিতভাবে অন্যের কাছে পৌঁছানোর বিশেষ পদ্ধতিকে। আরও সহজ করে বলা যায়, দূরের কিংবা কাছের কোনো আত্মীয়-স্বজন বা বন্ধু-বান্ধবের কাছে নিজের প্রয়োজনীয় কথাগুলো লিখে জানানোর পদ্ধতিকে চিঠি বা পত্র লিখন বলে।

❑ **চিঠি বা পত্রের বিভিন্ন অংশ :**

একটি চিঠি বা পত্রে সাধারণত ছয়টি অংশ থাকে। এগুলো হলো- ১. যেখান থেকে চিঠি লেখা হচ্ছে সে জায়গার নাম ও তারিখ; ২.সম্বোধন বা সম্ভাষণ; ৩. মূল বক্তব্য; ৪. বিদায় সম্ভাষণ; ৫. প্রেরকের (যে চিঠি পাঠাচ্ছে তার) স্বাৰর ও ৬. প্রাপকের (যে চিঠি পাবে তার) নাম ও ঠিকানা।

❑ **চিঠি বা পত্র লেখার নিয়ম :**

চিঠি বা পত্র লেখার সময় সাধারণ কয়েকটি নিয়ম পালন করতে হয়। যেমন– ১. সুন্দর ও স্পষ্ট হস্তাবরে লেখা; ২. সহজ, সরল ভাষায় লেখা; ৩. নির্ভুল বানানে লেখা; ৪. চলিত ভাষায় লেখা; ৫. বিরামচিহ্নের যথাযথ ব্যবহার করা; ৬. একই কথার পুনরাবৃত্তি না করা; ৭. পাত্রভেদে সম্মান ও স্নেহসূচক বাক্য ব্যবহার ইত্যাদি।

❑ **চিঠি বা পত্রের প্রকারভেদ :**

বিষয়বস্তু বিবেচনায় চিঠিকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। যথা–

১. ব্যক্তিগত চিঠি। যেমন– মা-বাবা বা বন্ধু-বান্ধবকে ব্যক্তিগত বিষয় উলেরখ করে লেখা চিঠি।

২. সামাজিক চিঠি। যেমন– সামাজিক কোনো সমস্যা জানিয়ে সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য কিংবা প্রশাসনকে জানানোর জন্য লেখা চিঠি।

৩. ব্যবহারিক চিঠি। যেমন– ব্যবহারিক প্রয়োজনে লেখা আবেদনপত্র, ব্যবসাপত্র, নিমন্ত্রণপত্র ইত্যাদি।

❑ **ব্যক্তিগত পত্র :**

[পাঠ্য বই থেকে]

১। **তোমার ছাত্রাবাস জীবনের অভিজ্ঞতা জানিয়ে তোমার মাকে পত্র লেখো।**

শাহজাদপুর
সিরাজগঞ্জ
১৪ই জুন ২০১৭

পূজনীয় মা

আমার প্রণাম নিও। বাবাকে আমার প্রণাম দিও। তুমি ও বাবা কেমন আছ? তোমাদের জন্য আমার সব সময়ই চিন্তা হয়। নিজেদের শরীরের প্রতি যত্ন নিও। আমি এক সপ্তাহ আগে আমার স্কুলের ছাত্রীনিবাসে উঠেছি। ছাত্রীনিবাসের পরিবেশ খুবই ভালো। বিভিন্ন শ্রেণির ছাত্রীরা এখানে থাকে। ছাত্রীরা পরস্পরের প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতিশীল। যে কারণে কারো কোনো সমস্যা হয় না। অবসর সময়ে অনেকে একসাথে গল্প করি। আমাদের বাড়িতে সন্ধ্যায় যেমন সবাই একত্রে আড্ডা দিই, অনেকটা সেই রকম। ছাত্রীনিবাসের মধ্যেই একটি ছোট পাঠাগার আছে। এখানে পাঠ্যবইয়ের পাশাপাশি সাহিত্য, বিজ্ঞান ও সাধারণ জ্ঞানের বই আছে। ওখানে বসে বই পড়া যায় আবার তিন দিনের জন্য কক্ষেও নিয়ে আসা যায়। আমার কক্ষে যে মেয়েটি আছে সেও ৭ম শ্রেণির ছাত্রী। ওর নাম মনি। ও খুলনার মেয়ে। মনি খুবই সুন্দর রবীন্দ্রসংগীত গায়। তোমাদের জন্য মন খারাপ হলে মনি আমাকে গান শোনায়। আমার কক্ষটা চারতলায়। কক্ষের জানালায় দাঁড়ালে সবুজ গাছের উপর দিয়ে সুন্দর আকাশ দেখা যায়। ছাত্রীনিবাসে একটি মিলনায়তন আছে, সেখানে ক্যারাম ও টেবিল টেনিস খেলা যায়, শীতের সময় ব্যাডমিন্টন খেলার ব্যবস্থা করা হয়। প্রথম প্রথম ছাত্রীনিবাসের খাবার খুব ভাল লাগত না, তখন তোমার রান্নার কথা খুব মনে হতো। কিন্তু এখন অভ্যস্ত হয়ে গেছি। প্রতি মাসে দুইবার বিশেষ খাবারের ব্যবস্থা করা হয়, তখন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন থাকে অনেকটা উৎসবের মতো। আমাকে নিয়ে চিন্তা করো না। আশা করি আমি ভালোই থাকব। স্বচ্ছ কেমন আছে? ওর লেখাপড়ার প্রতি নজর রেখো। পূজার ছুটি হলেই আমি বাড়ি চলে আসব। আমার জন্য আশীর্বাদ করো।

ইতি
তোমাদের আদরের
শুভ্রা গোস্বামী

	ডাকটিকেট
প্রেরক শুভ্রা গোস্বামী শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ	প্রাপক মনি গোস্বামী কলেজ রোড, সিরাজগঞ্জ

২। **তোমার জীবনের লক্ষ্য কী জানিয়ে বড় ভাইকে চিঠি লেখো।**

দোহার, ঢাকা
১৩ ই জানুয়ারি ২০১৭

শ্রদ্ধেয় বড় ভাই,

আমার সালাম নিবেন। বাড়ির সকলে আমরা ভালো আছি। আমার স্কুলের ক্লাস ভালোভাবে শুরু হয়েছে। আমিও পড়াশোনা শুরু করেছি। আদরের ছোট বোন অত্রিকে ভর্তি করানো হয়েছে। আপনার কথামতো আমরা দু'জনে একসঙ্গে স্কুলে যাই। আপনি চিন্তা করবেন না।

আপনি জানতে চেয়েছিলেন আমি বড় হয়ে কী হতে চাই। আমাদের জলীল স্যারকে তো আপনি চিনেন। আমি স্যারকে খুব পছন্দ করি। স্যার আমাদেরকে খুব ভালোভাবে পড়ান। পড়ানোর সময় আমরা কীভাবে বড় হতে পারব, দেশের মানুষের সেবা করতে পারব, পৃথিবীকে আরো সুন্দর করতে পারব এসব বলেন। আমার মনে হয়, আমাদের

দেশের জন্য এখনো আদর্শ শিক্ষক অনেক বেশি দরকার। তাই আমি ঠিক করেছি, ভালোভাবে পড়ালেখা শেষ করে আমি শিক্ষক হব।

আপনি আমার জন্য দোয়া করবেন। আমাদের এলাকার সবাই ভালো আছেন। দাদা–দাদি এখন বেশ সুস্থ। আপনি বাড়ি আসার সময় আমার জন্য বিজ্ঞানবিষয়ক মাসিক পত্রিকা নিয়ে আসবেন। ভালো থাকবেন।

ইতি

আপনার আদরের

সুমন রহমান অর্ক

[ঠিকানাসহ খাম হবে]

৩। তোমার এলাকার একটি লোকজ উৎসবের বর্ণনা দিয়ে প্রবাসী বন্ধুকে পত্র লেখো।

প্রিয়াঙ্কা বড়ুয়া

রাজানগর, চট্টগ্রাম

তারিখ : ৮ই মে ২০১৭

প্রিয় পুতুল,

আমার প্রীতি ও ভালোবাসা নাও। আজ প্রায় দুই বছর হতে চলল তুমি রাশিয়া চলে গেছ। আমাদের দুজনের জীবন যে প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর ছিল তা কিছুতেই ভুলতে পারি না। তুমি তোমার বাবা-মার সঙ্গে রাশিয়া চলে যাওয়ার পর এখনো আমাদের এলাকার নানা অনুষ্ঠান সেই আগের মতোই আমরা উপভোগ করি। তবে আমরা তোমার অভাব বোধ করি। এবার আমাদের এলাকায় বেশ বড় আয়োজনে বৈশাখী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ আমি সেই উৎসবের কথা বলতেই তোমাকে চিঠি লিখছি।

তুমি তো জান আমাদের সারা বাংলাদেশেই পহেলা বৈশাখ নববর্ষ হিসেবে পালিত হয়। এখন আমাদের রাঙ্গুনিয়াতেও পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে ব্যাপক আয়োজনে নানা অনুষ্ঠান হয়। রাজানগরে এবারই প্রথম বৈশাখী উৎসবের অনুষ্ঠান হয়। স্বপন, পুলক, হ্যাপী, চৈতালী, অনিক, দীপা, কুমকুম, নাহার, রাজু, সজল এবং আমি সবাই মিলে সকাল সকাল আমাদের বিদ্যাময়ী স্কুলের মাঠে চলে যাই। প্রথমে ওখান থেকে সকাল সাতটায় শুরু হয় বৈশাখী শোভাযাত্রা। নানা রঙের ব্যানার ফেস্টুন হাতে আমরা র‍্যালিতে অংশ নেই। র‍্যালি শেষ করে স্কুলের মাঠে চলে আসি। ওখানেই বিশাল আকারে মেলা বসেছে। মাঠের উত্তর দিকে চড়কগাছের আয়োজন, তার পাশে বসেছে চুড়ির দোকান। ছোট ছোট বাক্সে নানা ধরনের চুড়ির পসরা সাজিয়ে বসেছে মহিলারা। তার পাশে চানাচুর ও নিমকি ভাজা ও বিক্রি চলছে। আমি গরম নিমকি ভাজা আধা কেজি কিনে সবাই মিলে খেয়েছি আর ঘুরে ঘুরে মেলাটা দেখেছি। মাঠের পূর্ব কোণে বাঁশ-বেতের নানা গৃহস্থালি দ্রব্য নিয়ে বসেছে বিক্রেতারা। ওখানেও বেশ ভিড়। তার পাশেই নানা ধরনের বেলুন, বাঁশির পসরা বসেছে। আমি আমার ছোট বোন প্রিয়ন্তির জন্য বেলুন ও বাঁশি কিনেছি। ওর জন্য রঙিন ফিতাও কিনেছি। দীপা তো যেটা দেখে সেটাই কিনে এমন অবস্থা ওর। হাতে যে কয়টা টাকা ছিল সব টাকায় দীপা ওর ভাই বোনের জন্য নানা জিনিসপত্র কিনেছিল। রাজু, সজল, হ্যাপী, অনিক, স্বপন বাঁশের তৈরি কলমদানি কিনেছিল। আমরা সবাই মিলে চড়কগাছেও উঠলাম। ওখানে উঠে তো চৈতালী ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। কিন্তু কি আর করা দশপাক না খেয়ে তো আর নামা যাবে না। চৈতালী বলেছে, ও আর কখনো চড়কগাছে উঠবে না।

আজ আর লিখছি না। তুমি ভালো থেকো। জ্যাঠা-জ্যাঠাইমাকে শ্রদ্ধা দিও। তোমার সব খবর জানিয়ে আমাকে লিখো। তোমার জন্য অসীম ভালোবাসা রইল।

ইতি

প্রিয়াঙ্কা বড়ুয়া

[ঠিকানাসহ খাম হবে]

[অতিরিক্ত অংশ]

৪. কম্পিউটার শিক্ষার গুরুত্ব বর্ণনা করে তোমার ছোট বোন বনানীকে একটি চিঠি লেখো।

আহসান রোড, খুলনা।

১৭.০৭.২০১৭

প্রিয় বনানী,

আমার স্নেহাশিস নিও। অনেক দিন পর তোমার চিঠি পেলাম। তুমি ক্লাসে প্রথম হয়েছ জেনে খুব আনন্দিত হয়েছি। আমি আরো খুশি হয়েছি তুমি ক্লাসের পড়াশোনার বাইরে কম্পিউটার শিখছ বলে।

বর্তমান যুগ হচ্ছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগ। আর প্রযুক্তির এ যুগে সর্বোচ্চ স্থান দখল করে আছে কম্পিউটার। কম্পিউটার ছাড়া আধুনিক জীবন-যাপন কল্পনা করা যায় না। শিৰা, সংস্কৃতি, খেলাধুলা, ব্যবসাবাণিজ্য, অফিস-আদালত, চিকিৎসা, বিনোদন– সব ৰেত্রেই কম্পিউটারের ব্যবহার আজ অপরিহার্য। তাই কর্মৰেত্রেও এখন কম্পিউটার জানা লোকদের অগ্রাধিকার। কম্পিউটার–অভিজ্ঞ লোক বেকার বসে থাকে না। তাই বর্তমান শিৰা ব্যবস্থায় কম্পিউটার শিৰার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। আমাদের প্রত্যেকেরও উচিত অন্যান্য বিষয়ের সাথে কম্পিউটার শিৰার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া। তুমি ক্লাসের পড়াশোনার পাশাপাশি কম্পিউটার ভালোভাবে আয়ত্ত করবে, আমার এই শুভ কামনা রইল।

আজ আর না। মা ও বাবাকে আমার সালাম দিও। তুমি ভালো থেকো।

ইতি–

তোমার ভাইয়া

রনি

[ঠিকানাসহ খাম হবে]

৫. মনে করো, তুমি কাজল। তোমার বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। পরীক্ষার ফলাফল সম্পর্কে জানিয়ে বাবার কাছে একটি পত্র লেখো।

বাজিতপুর

ডিসেম্বর ২৫, ২০১৭

শ্রদ্ধেয় বাবা,

সালাম নিন। আশা করি ভালো আছেন। গতকাল আপনার চিঠি পেলাম। আপনার আসতে দেরি হবে জেনে মনটা বেশ খারাপ হলো।

আজ আমার বার্ষিক পরীবার ফল প্রকাশিত হয়েছে। আমার ফল জেনে আপনি নিশ্চয়ই খুশি হবেন। আমি A^+ পেয়েছি। দোয়া করবেন, আমি যেন ভবিষ্যতে আপনার মুখ উজ্জ্বল করতে পারি।

আপনাকে অনেক দিন দেখিনি। আপনাকে খুব দেখতে ইচ্ছে করে। ছুটি নিয়ে এক দিনের জন্য হলেও আমাদের সঙ্গে দেখা করে যান। আমরা আপনার অপেৰায় রইলাম।

বাড়ির সবাই ভালো আছে। আপনি শরীরের প্রতি যত্ন নেবেন। ভালো থাকবেন।

ইতি

আপনার স্নেহের

কাজল।

[ঠিকানাসহ খাম হবে]

৬. মনে করো, তোমার নাম খসরু। তোমার বড় বোনের বিয়ের দিন ঠিক করা হয়েছে। তোমার প্রিয় বন্ধু হামিদকে এ উপলক্ষ্যে একটি চিঠি লেখো।

পূর্ব ঘোপাল, ফেনী

২৫শে মার্চ, ২০১৭

প্রিয় হামিদ,

শুভেচ্ছা নিও। আশা করি ভালো আছ। আগামী ১০ই এপ্রিল আমার বড় আপার বিয়ের দিন ঠিক হয়েছে। তুমি অবশ্যই আসবে। মা, আপা সবাই তোমাকে আসতে বলেছেন। তুমি কিন্তু ৭ তারিখের মধ্যেই চলে আসবে, কেমন? অনেক কাজ করতে হবে। আমাদের সব বন্ধুরাই আসছে। খুব মজা হবে।

আজকের মতো বিদায়। সাবধানে এসো।

ইতি

তোমার বন্ধু

খসরব

[ঠিকানাসহ খাম হবে]

৭. মনে করো, তুমি ফরহাদ। গ্রীষ্মের ছুটি কীভাবে কাটাবে তা জানিয়ে তোমার বন্ধু শফিককে একটি চিঠি লেখো।

বয়রা, খুলনা

১০/০৪/২০১৭

প্রিয় শফিক,

ভালোবাসা নিও। তোমার চিঠি পেয়ে খুব আনন্দিত হয়েছি।

তোমাকে একটা খুশির খবর দিই, এপ্রিল মাসের শেষ সপ্তাহে আমাদের বিদ্যালয়ে গ্রীষ্মের ছুটি শুরব হবে। এবারের ছুটিতে মা-বাবার সাথে আমি সোনারগাঁও ও পাহাড়পুর যাব। এ দুটিই আমাদের দেশের অত্যন্ত গুরবত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক স্থান। স্থানগুলোতে গেলে বাংলার প্রাচীন ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে অনেক কিছু জানা যাবে। তুমিও চলোনা আমাদের সাথে। খুব মজা হবে।

ভালো থেকো। তোমার মতামত জানিও।

ইতি

তোমার শুভার্থী

ফরহাদ

[ঠিকানাসহ খাম হবে]

৮. মনে করো, তোমার নাম অহনা/অহন। তোমার কলকাতা প্রবাসী এক বন্ধুর নাম বাদল/বৃষ্টি। ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে তুমি যা জান তা তোমার বন্ধুকে জানিয়ে একটি চিঠি লেখো। ধরো, তোমার বন্ধুকে লেখার ঠিকানা– ৩৬, সল্ট লেক, কলকাতা, ভারত।

মহিষাকান্দি, নরসিংদী।

২২শে ফেব্রবয়ারি, ২০১৭

প্রিয় বাদল,

কেমন আছ? আমি ভালোই আছি। কাল ছিল আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। আজ তোমাকে ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস জানিয়ে লিখছি।

১৯৫২ সালের ২৬শে জানুয়ারি পূর্ব পাকিস্তানের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিন ঘোষণা দেন যে, উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। এর প্রতিবাদে ফেটে পড়ে বাংলার ছাত্র সমাজ। ২১শে ফেব্রবয়ারিকে সংস্কৃতিক সংগঠনগুলো রাষ্ট্রভাষা দিবস হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত

নেয়। অন্যদিকে ২০শে ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যা থেকে ঢাকায় ১৪৪ দ্বারা জারি করা হয়। ২১শে ফেব্রুয়ারির দিন সেরাগানে সেরাগানে রাজপথ উত্তাল হয়ে ওঠে। সরকারের জারি করা ১৪৪ ধারার পরোয়া না করেই এগিয়ে গেল ছাত্র-জনতা। পুলিশের গুলিতে রফিক, বরকত, জব্বারসহ আরও অনেকে শহিদ হলেন। এ ঘটনা সারা দেশের মানুষকে বিক্ষুব্ধ করে তুলল। রাস্তায় নেমে এলো লাখো জনতা। অবশেষে ভাষাশহিদদের জীবনের বিনিময়ে আমরা পেলাম মাতৃভাষা বাংলায় কথা বলার অধিকার। তোমার বাবা-মাকে আমার সালাম জানিও। আজ বিদায় নিচ্ছি।

ইতি

তোমার বন্ধু

অহনা

BY AIR MAIL	STAMP
From Badal Mohishalkandi, Narsinghdi, BANGLADESH.	To, Ahona 36, Salt lake, Calcutta, INDIA.

৯. মনে করো, তোমার নাম সাকিব/সালমা। তোমার বন্ধুর নাম অয়ন/আয়না। সম্প্রতি তুমি একটি স্থান থেকে বেড়িয়ে এসেছ। সেই ভ্রমণের অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়ে তোমার বন্ধুকে একটি পত্র লেখো।

মালিবাগ, ঢাকা।

১৭/০২/২০১৭

প্রিয় অয়ন,

শুভেচ্ছা নিও। আশা করি ভালো আছ।

গত সপ্তাহে বাবা-মা'র সাথে সেন্টমার্টিন থেকে ঘুরে এসেছি। দারুন মজা হয়েছে। ঢাকা থেকে ট্রেনে চড়ে প্রথমে গিয়েছি চট্টগ্রাম। সেখান থেকে বাসে করে টেকনাফ। তারপর জাহাজে সেন্টমার্টিন পৌঁছেছি। সেন্টমার্টিনের সৌন্দর্য বলে বোঝানোর মতো না। সাগরের স্বচ্ছ নীল পানি, রাতের আকাশে হাজার তারার মেলা, সৈকতে ঘুরে বেড়ানো নানা রঙের কাঁকড়া, সূর্যোদয়ের দৃশ্য ইত্যাদি দেখে মুগ্ধ হয়ে গেছি। অনেক রকমের সামুদ্রিক মাছের স্বাদ নিয়েছি। আর খেয়েছি সেন্টমার্টিনের সুমিষ্ট ডাবের পানি। সেন্টমার্টিনের অদূরেই আছে ছেঁড়াদ্বীপ। নৌকায় চড়ে সেখানেও গিয়েছি। সেন্টমার্টিনে আমরা দুই দিন ছিলাম। ফেরার পথে টেকনাফ এসে বাসে চড়ে সরাসরি ঢাকায় ফিরেছি। সব মিলিয়ে সেন্টমার্টিন ভ্রমণের স্মৃতি ভোলার মতো নয়।

আজ বিদায় নিচ্ছি। তোমার ময়না পাখিটার কী খবর? ভালো থেকো।

ইতি

তোমার বন্ধু

সাকিব

[ঠিকানাসহ খাম হবে]

১০. মনে করো, তোমার নাম মানিক। তোমার বন্ধুর নাম রিয়াজ। সম্প্রতি তোমার এলাকায় ঘটে যাওয়া একটি সড়ক দুর্ঘটনার বর্ণনা দিয়ে বন্ধুকে একটি পত্র লেখো।

যাত্রাবাড়ী, ঢাকা

১৪ই মার্চ ২০১৭

প্রিয় রিয়াজ,

শুভেচ্ছা নিও। কেমন আছ? কয়েকদিন আগে আমার চোখের সামনে একটি মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে গেল। সেই দুঃসহ অভিজ্ঞতার কথা জানিয়ে তোমাকে লিখছি।

তখন বিকেল প্রায় চারটা। স্কুল ছুটির পর বাড়ি ফিরছি। একটি অল্পবয়সী ছেলে রাস্তা পার হওয়ার চেষ্টা করছিল। কাছেই ফুট-ওভারব্রিজ থাকলেও ছেলেটি তা ব্যবহার করছিল না। হঠাৎ তাড়াহুড়ায় রাস্তা পার হওয়ার সময় উল্টোদিক থেকে একটি বাস এসে তাকে চাপা দিয়ে চলে গেল। ঘটনাস্থলেই ছেলেটির মৃত্যু হলো। রক্তে রাজপথ ভেসে যাচ্ছিল। ছেলেটিকে দেখে চেনার কোনো উপায় ছিল না। চোখের সামনে এমন দৃশ্য দেখে আমার মাথা ঘুরে গেল। দ্রুত বাড়ি ফিরে এলাম।

ভালো থেকো। রাস্তা পারাপারে সব সময় সাবধান থাকবে। চাচা-চাচিকে আমার সালাম জানিও।

ইতি

তোমার বন্ধু

মানিক

[ঠিকানাসহ খাম হবে]

❑ আবেদন পত্র :

[পাঠ্যবই থেকে]

১. জরিমানা মওকুফের জন্য প্রধান শিক্ষকের কাছে আবেদন।

তারিখ : ৩রা নভেম্বর ২০১৭

বরাবর

প্রধান শিক্ষক

কার্তিকপুর উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা।

মাধ্যম : শ্রেণিশিক্ষক।

বিষয় : জরিমানা মওকুফের জন্য আবেদন।

মহোদয়,

বিনীত নিবেদন এই যে, আমি আপনার বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণির ছাত্র। আমি সাধারণত প্রতি মাসের নির্ধারিত তারিখেই আমার বেতন পরিশোধ করে থাকি। কিন্তু এ মাসে বাবা টাকা পাঠাতে দেরি করায় নির্দিষ্ট দিনে বেতন পরিশোধ করতে পারিনি। যে কারণে আমার জরিমানা হয়েছে। আমি আজ বেতন পরিশোধ করতে চাই। কিন্তু আমার পক্ষে জরিমানা দেওয়া কষ্টকর।

অতএব, বিনীত আবেদন এই যে, সহৃদয় বিবেচনার মাধ্যমে জরিমানা মওকুফ করে, আমার বেতন পরিশোধ করার অনুমতি দিয়ে বাধিত করবেন।

নিবেদক
আপনার একান্ত অনুগত ছাত্র
ফয়সাল আহমেদ সুমন
শ্রেণি : সপ্তম
রোল নম্বর : ৯

২. স্কুলে সুপেয় পানির ব্যবস্থা করার জন্য প্রধান শিক্ষকের নিকট আবেদন।

তারিখ : ৩রা আগস্ট ২০১৭

বরাবর
প্রধান শিক্ষক
জামালপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়
জামালপুর।

বিষয় : সুপেয় পানির ব্যবস্থা করার জন্য আবেদন।

মহোদয়,

বিনীত নিবেদন এই যে, আমাদের স্কুলের টিউবওয়েলটি আর্সেনিকমুক্ত না হওয়ায় আমরা খাবার পানির বিশেষ সংকটে আছি। এ অবস্থায় আমাদের স্কুলে দ্রুত একটি আর্সেনিকমুক্ত টিউবওয়েল স্থাপন করা দরকার।

অতএব, জনাবের নিকট বিনীত আবেদন, জরুরি ভিত্তিতে একটি আর্সেনিকমুক্ত টিউবওয়েল স্থাপন করে বাধিত করবেন।

বিনীত নিবেদক
জামালপুর স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে
অনিন্দ্য সোম
শ্রেণি : ৭ম
রোল : ০৫

৩. তোমার এলাকায় পাঠাগার স্থাপনের জন্য উপজেলা চেয়ারম্যানের নিকট একটি আবেদন পত্র লেখো।

তারিখ : ২রা জুন ২০১৭

বরাবর
উপজেলা চেয়ারম্যান
গোদাগাড়ী উপজেলা পরিষদ
রাজশাহী।

বিষয় : গোদাগাড়ী পূর্বপাড়ায় একটি পাঠাগার স্থাপনের জন্য আবেদন।

মহোদয়,

সম্মানপূর্বক বিনীত নিবেদন এই যে, আমাদের গোদাগাড়ী পূর্বপাড়ায় হাইস্কুল ও প্রাইমারি স্কুলের ছাত্রছাত্রীসহ জনসংখ্যা প্রায় দুই হাজারের ওপরে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হচ্ছে, এখানে কোনো পাঠাগার নেই। ছাত্র-ছাত্রীদের জ্ঞানচর্চা, মানসগঠন ও সৃজনশীল চেতনা বিকাশে একটি পাঠাগার খুবই প্রয়োজন। এছাড়া এলাকায় দৈনিক পত্রিকা ও সাময়িক পত্র-পত্রিকা পড়ারও কোনো ব্যবস্থা নেই। এখানে একটি পাঠাগার হলে তরুণরাও তাদের অলস সময়কে জ্ঞানচর্চার মতো প্রয়োজনীয় কাজে ব্যয় করতে পারবে।

অতএব, গোদাগাড়ী পূর্বপাড়ায় সকল বয়সের জনসাধারণের উপকারের কথা বিবেচনা করে অতিসত্বর এখানে একটি পাঠাগার স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আপনাকে বিশেষভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি।

নিবেদক
গোদাগাড়ী পূর্বপাড়ার জনসাধারণের পক্ষে
রোদেলা শারমিন

৪. জাতীয় শোক দিবসের অনুষ্ঠানের প্রস্তুতির জন্য ৪র্থ (চতুর্থ) ঘণ্টার পর ক্লাস স্থগিতের জন্য আবেদন।

তারিখ : ১৪ই আগস্ট ২০১৭

বরাবর
প্রধান শিক্ষক
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় স্কুল ও কলেজ
সাভার, ঢাকা।

বিষয় : জাতীয় শোক দিবসের অনুষ্ঠানের প্রস্তুতির জন্য ৪র্থ ঘণ্টার পর ক্লাস স্থগিতের জন্য আবেদন।

মহোদয়,

সম্মানপূর্বক নিবেদন এই যে, আমাদের বিদ্যালয়ে আগামীকাল ১৫ই আগস্ট জাতীয় শোক দিবস পালন করা হবে। শোক দিবসের অনুষ্ঠানের বিভিন্ন কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য প্রতিটি শ্রেণিকেই কোনো না কোনো দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আমাদের ওপর দায়িত্ব পড়েছে মঞ্চ সজ্জা। আগামীকালের শোক দিবসের সার্বিক কাজ সুসম্পন্ন করার জন্য আজ ৪র্থ ঘণ্টার পর ক্লাসসমূহ স্থগিত করলে ভালো হয়।

অতএব, জনাবের নিকট বিনীত আবেদন, ৪র্থ ঘণ্টার পর ক্লাসসমূহ স্থগিত করে বাধিত করবেন।

বিনীত নিবেদক
আপনার একান্ত বাধ্যগত ছাত্র
মোহন আফজাল পৃথিবী
শ্রেণি : সপ্তম
রোল : ০৩

[অতিরিক্ত অংশ]

৫. মনে করো, তোমার বাবা একটি ব্যাংকে চাকরি করেন। সম্প্রতি তোমার বাবার বদলি হয়েছে। তাই তোমাকেও তার সাথে চলে যেতে হবে। এজন্য তোমার স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কাছে ছাড়পত্র চেয়ে আবেদন করো।

১৫.২০.২০১৬

বরাবর,
প্রধান শিৰক,
ছাগলনাইয়া পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়
ফেনী।

বিষয় : বিদ্যালয় থেকে ছাড়পত্র পাওয়ার জন্য আবেদন।

মহোদয়,

বিনীত নিবেদন এই যে, আমি আপনার বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণির একজন ছাত্রী। আমার বাবা একজন ব্যাংক কর্মকর্তা। সম্প্রতি তাঁকে কক্সবাজার জেলা শহরে বদলি করা হয়েছে। তাই পরিবারের সবার সঙ্গে আমাকেও কক্সবাজার যেতে হচ্ছে। সেখানে নতুন করে ভর্তির জন্য এই বিদ্যালয়ের ছাড়পত্র প্রয়োজন।

অতএব, অনুগ্রহপূর্বক আমাকে বিদ্যালয় ত্যাগের ছাড়পত্র দিয়ে বাধিত করবেন।

নিবেদক,
ফারিহা তাবাসসুম
রোল নং – ১২, ৭ম শ্রেণি
ছাগলনাইয়া পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়

৬. ধরো, তুমি এ.কে. উচ্চ বিদ্যালয়, দনিয়া, ঢাকার সপ্তম শ্রেণির ছাত্র। তোমাদের স্কুলে একটি 'বিজ্ঞান ক্লাব' গঠনের অনুমতি চেয়ে প্রধান শিক্ষকের নিকট একখানা আবেদন পত্র রচনা কর।

১৮.০৭.২০১৭

বরাবর,
প্রধান শিৰক,
এ.কে. উচ্চ বিদ্যালয়, দনিয়া, ঢাকা।

বিষয় : 'বিজ্ঞান ক্লাব' গঠনের অনুমতির জন্য আবেদন।

মহোদয়,

সবিনয় নিবেদন এই যে, আমরা আপনার বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রী। বেশ কিছুদিন থেকে আমরা স্কুলে বিজ্ঞানচর্চার জন্য একটি বিজ্ঞান ক্লাবের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এই চরম উৎকর্ষের যুগে বিজ্ঞানচর্চা ছাড়া শিৰা সম্পূর্ণ হয় না। আর বিজ্ঞান ক্লাব গঠন করা হলে বিজ্ঞান বিষয়ে আলোচনা, তথ্য আদান-প্রদান, পত্র–পত্রিকা প্রকাশ করা সম্ভব হবে। বিজ্ঞান বিষয়ে পড়াশোনা ও গবেষণা করে আমরা নতুন নতুন বিজ্ঞান প্রজেক্ট তৈরিতেও দ্রুত সফলতা অর্জন করব।

অতএব, মহোদয়ের নিকট বিনীত প্রার্থনা, আমাদের বিদ্যালয়ে একটি 'বিজ্ঞান ক্লাব' গঠনের অনুমতি ও প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করে বাধিত করবেন।

নিবেদক–
সপ্তম শ্রেণির শিৰার্থীদের পৰে
আবদুস সালাম
এ.কে. উচ্চ বিদ্যালয়, দনিয়া, ঢাকা।

৭. মনে করো, তোমার নাম সেলিম চৌধুরী। তোমার বিদ্যালয়ের নাম জয়পুর সরোজিনী উচ্চ বিদ্যালয়। অসুস্থতার জন্য তুমি তিন দিন বিদ্যালয়ে যেতে পারনি। অনুপস্থিতির ছুটি মঞ্জুরের জন্য প্রধান শিক্ষকের নিকট একটি আবেদনপত্র লেখো।

২৪.০৪.২০১৭

বরাবর
প্রধান শিৰক
জয়পুর সরোজিনী উচ্চ বিদ্যালয়
ছাগলনাইয়া, ফেনী।

বিষয় : অনুপস্থিতির ছুটি মঞ্জুরের জন্য আবেদন।

জনাব,

বিনীত নিবেদন এই যে, হঠাৎ জ্বরে আক্রান্ত হওয়ার কারণে আমি গত ২১/০৪/২০১৭ থেকে ২৩/০৪/২০১৭ এ তিন দিন বিদ্যালয়ে উপস্থিত হতে পারিনি।

অতএব, অনুগ্রহপূর্বক আমাকে উক্ত তিন দিনের ছুটি মঞ্জুর করে বাধিত করবেন।

বিনীত নিবেদক
আপনার একান্ত অনুগত ছাত্র
সেলিম চৌধুরী
শ্রেণি– ৭ম, রোল– ৭

৮. মনে করো, তুমি রোকাইয়া শশী। আগামী ২৫শে জুন তোমার বড় বোনের বিয়ে। এ উপলক্ষ্যে চার দিনের অগ্রিম ছুটি চেয়ে তোমার বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের নিকট একটি আবেদনপত্র লেখো।

২১.০৬.২০১৭

বরাবর
প্রধান শিৰক
মতিঝিল সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়
ঢাকা।

বিষয় : অগ্রিম ছুটির জন্য আবেদন।

মহোদয়,

সবিনয় নিবেদন এই যে, আগামী ২৫শে জুন আমার বড় বোনের শুভ বিবাহ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এ বিষয়ে আমাকে বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাকতে হবে। তাই আমার ২২শে জুন থেকে ২৫শে জুন পর্যন্ত মোট ৪ দিনের ছুটি অত্যন্ত প্রয়োজন।

অতএব, অনুগ্রহপূর্বক আমাকে উক্ত ৪ দিনের ছুটি মঞ্জুর করে বাধিত করবেন।

নিবেদক
আপনার অনুগত ছাত্রী
রোকাইয়া শশী
৭ম শ্রেণি, শাখা–ক
রোল–০১

৯. মনে করো, তোমার নাম সিরাজ আহমেদ। তোমার বিদ্যালয়ের নাম গাজীরখামার সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়। বিনা বেতনে অধ্যয়নের সুযোগ চেয়ে প্রধান শিক্ষকের নিকট একটি আবেদনপত্র লেখো।

০২.০৩.২০১৭

বরাবর
প্রধান শিৰক
গাজীরখামার সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়
গাজীরখামার, শেরপুর।

বিষয় : বিনা বেতনে অধ্যয়নের জন্য আবেদন।

জনাব,

বিনীত নিবেদন এই যে, আমি আপনার বিদ্যালয়ের ৭ম শ্রেণির 'খ' শাখার একজন নিয়মিত ছাত্র। প্রথম শ্রেণি হতেই আমি আমি আপনার বিদ্যালয়ে পড়ছি এবং বরাবরই প্রথম হয়ে আসছি। আমার ছোট বোনও এই বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ছে। আমার বাবা একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। বাবার সামান্য আয়ে আমাদের যাবতীয় খরচ চালানো খুবই কষ্টকর। এ অবস্থায় তাঁর পৰে আমাদের দুই ভাইবোনের লেখাপড়ার ব্যয়ভার বহন করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

অতএব, বিনীত প্রার্থনা এই যে, আমাকে আপনার বিদ্যালয়ে বিনা বেতনে অধ্যয়ন করার সুযোগ দিয়ে বাধিত করবেন।

বিনীত নিবেদক
সিরাজ আহমেদ
৭ম শ্রেণি, শাখা–খ
রোল–০১

১০. মনে করো, তোমার নাম ইকবাল হাসান। ফুটবল খেলা দেখার জন্য ছুটি চেয়ে প্রধান শিক্ষক বরাবর একটি আবেদনপত্র লেখো।

তারিখ : ১২ই মার্চ, ২০১৭

বরাবর,
প্রধান শিৰক
ক্যামব্রিয়ান স্কুল
মিরপুর, ঢাকা।

বিষয় : ফুটবল খেলা দেখতে যাওয়ার জন্য সাময়িক ছুটির আবেদন।

জনাব,

বিনীত নিবেদন এই যে, আগামীকাল সুজানগর উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে স্বাধীনতা দিবস ফুটবল কাপের ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। খেলাটিতে আমাদের স্কুল সুজানগর উচ্চ বিদ্যালয়ের মুখোমুখি হবে। আমরা সবাই খেলাটি দেখতে অত্যন্ত আগ্রহী।

অতএব, বিনীত প্রার্থনা, আগামীকাল দ্বিতীয় থেকে চতুর্থ পিরিয়ড পর্যন্ত ক্লাস বন্ধ রেখে আমাদের খেলাটি দেখার সুযোগ দিয়ে বাধিত করবেন।

নিবেদক

বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের পবে

ইকবাল হাসান

শ্রেণি : ৭ম; শাখা– ক

রোল নং– ০২।

৫. প্রবন্ধ রচনা

- **প্রবন্ধ কী :** কোনো একটি বিষয়কে ভাব ও চিন্তার মধ্য দিয়ে ভাষায় প্রাণবন্ত করে প্রকাশ করাই হচ্ছে প্রবন্ধ।
- **প্রবন্ধের প্রকারভেদ :** বিষয়ভেদে প্রবন্ধকে প্রধানত তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়।
  যথা– ১. বর্ণনামূলক; ২. ঘটনামূলক; ও ৩. চিন্তামূলক।
- **প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে যা যা প্রয়োজন :** প্রবন্ধ রচনার সময় কিছু নিয়মকানুন অনুসরণ করা প্রয়োজন। তাহলে প্রবন্ধের মান বৃদ্ধি পায় এবং পরীবায় অধিক নম্বর পাওয়া যায়। এবেত্রে–
  ১. প্রবন্ধের বিষয় সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে।
  ২. চিন্তাপ্রসূত ভাবগুলো অবশ্যই ধারাবাহিকভাবে সাজাতে হবে।
  ৩. প্রত্যেকটি ভাব উপস্থাপন করতে হবে পৃথক অনুচ্ছেদে।
  ৪. একই ভাব, তথ্য বা বক্তব্য বারবার উলেরখ করা যাবে না।
  ৫. রচনার ভাষা হতে হবে সহজ, সরল ও প্রাঞ্জল।
  ৬. উপস্থাপিত তথ্যাবলি অবশ্যই নির্ভুল হতে হবে।
  ৭. বড় ও জটিল বাক্য যতটা সম্ভব পরিহার করতে হবে।
  ৮. নির্ভুল বানানে লিখতে হবে।
  ৯. সাধু ও চলিত ভাষার মিশ্রণ ঘটানো যাবে না।
  ১০. উপসংহারে সুচিন্তিত নিজস্ব মতামত উপস্থাপন করতে হবে।

[পাঠ্য বই থেকে]

১ আমাদের জাতীয় পতাকা

ভূমিকা : জাতীয় পতাকা একটি স্বাধীন জাতির সার্বভৌমত্বের প্রতীক। তাই প্রতিটি স্বাধীন দেশ ও জাতিরই একটি জাতীয় পতাকা আছে। জাতীয় পতাকা দেশের সব মানুষকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে। যেকোনো স্বাধীন দেশ বা জাতি তার জাতীয় পতাকাকে সর্বোচ্চ সম্মান প্রদর্শন করে থাকে।

জাতীয় পতাকার আকার ও আকৃতি : বাংলাদেশের জাতীয় পতাকায় ঘন সবুজ রঙের ওপর উদীয়মান সূর্যের রঙের একটি লাল বৃত্ত থাকবে। জাতীয় পতাকার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত ১০:৬। পতাকার দৈর্ঘ্য যদি ৩০৫ সেন্টিমিটার হয় (১০ ফুট) হয়, প্রস্থ ১৮৩ সেন্টিমিটার (৬ ফুট) হবে। লাল বৃত্তটির ব্যাসার্ধ হবে পতাকার দৈর্ঘ্যের পাঁচ ভাগের এক ভাগ। আমাদের জাতীয় পতাকার ডিজাইন করেছেন শিল্পী কামরুল হাসান।

মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার প্রতীক : বাংলাদেশ একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র। এদেশে সকল ধর্মের মানুষের বসবাস রয়েছে। কিন্তু ধর্ম আলাদা হলেও সবার ভেতরে রয়েছে একই জাতিসত্তা। আর তা হলো বাঙালি জাতিসত্তা। বহু ত্যাগের বিনিময়ে মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে আমরা স্বাধীনতা লাভ করেছি। লাল-সবুজের পতাকা আমাদের সে স্মৃতিকেই বহন করছে। এ পতাকা আমাদের সংগ্রামের ইতিহাসকে তুলে ধরে সব প্রজন্মের সামনে।

জাতীয় পতাকার বিশেষত্ব : আমাদের জাতীয় পতাকার সবুজ রং বাংলাদেশের শ্যামল প্রকৃতির দিকটিকে তুলে ধরেছে। লাল রং তুলে ধরেছে নবজাগরণের কথা। এছাড়া স্বাধীনতা অর্জনের জন্য এ দেশের মানুষ যে রক্ত দিয়েছে তার

ইজ্জিতও বহন করে লাল রং। মোটকথা, আমাদের দেশের স্বাধীনতা ও প্রকৃতিকে ধারণ করে আছে জাতীয় পতাকা।

জাতীয় পতাকার গুরুত্ব : জাতীয় পতাকা আমাদের সকল বৈষম্য দূর করে দেয়। আমরা এ পতাকার ছায়াতলে একত্রে মিলিত হই। আমরা পরস্পরের মধ্যে সকল ভেদাভেদ ভুলে যাই। এছাড়া আত্মস্বার্থ ত্যাগ করে দেশের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করার প্রেরণাও আমরা জাতীয় পতাকা থেকে পাই। আমাদের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও অগ্রগতির সঙ্গে জাতীয় পতাকা গভীরভাবে জড়িয়ে আছে। হিমালয়ের চূড়া থেকে শুরু করে আমাদের যে কোনো অর্জনেই জাতীয় পতাকা সবার আগে আমাদের হাতে উঠে আসে। আমাদের গৌরবময় ইতিহাসের স্মারক জাতীয় পতাকা। শুধু বর্তমানের নয়, ভবিষ্যতের সকল কর্মপ্রেরণার উৎসও আমাদের জাতীয় পতাকা।

জাতীয় পতাকার সম্মান : জাতীয় পতাকার জন্য আমরা গর্ববোধ করি। তাই একে সম্মান করা আমাদের একান্ত দায়িত্ব। বিদ্যালয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলনকালে তার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা আমাদের পবিত্র কর্তব্য। এছাড়া অন্যান্য স্থানে বা অনুষ্ঠানে যখনই জাতীয় পতাকা প্রদর্শন করা হোক না কেন, তখনই দাঁড়িয়ে তার প্রতি আমাদের সম্মান প্রদর্শন করা উচিত। যে জাতীয় পতাকাকে সম্মান করে না, সে সকলের ঘৃণার পাত্র। তাকে সকলে দেশদ্রোহী হিসেবে চিহ্নিত করে।

উপসংহার : জাতীয় পতাকা আমাদের সকলের কাছে অত্যন্ত মর্যাদার ও সম্মানের। বুকের রক্ত দিয়ে হলেও এর সম্মান রক্ষা করা আমাদের কর্তব্য। আমাদের লক্ষ লক্ষ বীর শহিদ এ পতাকার জন্যই তাঁদের জীবনদান করেছেন। যখন নীল আকাশের মাঝে আমাদের এ পতাকা উড়তে থাকে, তখন তা দেখে গর্বে আমাদের বুক ভরে যায়।

২ বাংলাদেশের নদনদী

ভূমিকা : কবি জীবনানন্দ দাশ বাংলাদেশে অসংখ্য নদীর সমাবেশ দেখে একে 'জলাঙ্গীর ঢেউয়ে ভেজা বাংলা' বলে অভিহিত করেছেন। ছোট-বড় প্রায় সাত শ নদী এ দেশকে ঘিরে রয়েছে। নদীকে ঘিরে গড়ে উঠেছে এদেশের অনেক জনপদ। মায়ের মতো স্নেহ দিয়ে নদীগুলো এদেশ ঘিরে রেখেছে। তাই এদেশকে নদীমাতৃক দেশ বলা হয়।

বাংলাদেশের প্রধান প্রধান নদনদী : বাংলাদেশের সব নদীর একটি সম্পূর্ণ তালিকা প্রস্তুত করা বেশ কঠিন কাজ। তবে এদেশের প্রধান কিছু নদীর নাম আমাদের সবারই জানা। সেগুলো হলো : পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র, কর্ণফুলি ও মাতামুহুরী।

পদ্মা : বাংলাদেশের প্রধান নদী পদ্মা। হিমালয়ের গঙ্গোত্রী হিমবাহ থেকে এর উৎপত্তি। ভারতে এ নদীর নাম গঙ্গা। মূলত গঙ্গা নদীর যে ধারাটি বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে, তার নামই পদ্মা। এ নদী রাজশাহী জেলার দক্ষিণ দিক দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গোয়ালন্দের নিকট যমুনা নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। পদ্মার প্রধান শাখানদীগুলো হচ্ছে : কুমার, মাথাভাঙ্গা, ভৈরব, গড়াই, মধুমতী ও আড়িয়াল খাঁ। মহানন্দা পদ্মার প্রধান উপনদী।

মেঘনা : মেঘনা নদীর জন্ম আসামের পাহাড়ে। সিলেটের সুরমা ও কুশিয়ারা নদীর মিলিত স্রোত আজমিরিগঞ্জের কাছে এসে 'কালনী' নামে পরিচিতি পেয়েছে। শেষে ময়মনসিংহ জেলার ভৈরববাজারের কাছে এসে এ নদী মেঘনা নাম ধারণ করেছে। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার তিতাস ও চাঁদপুরের ডাকাতিয়া মেঘনার দুটি প্রধান শাখা নদী। গোমতী, মনু, বাউলাই মেঘনার উপনদী।

যমুনা : যমুনার উৎস হিমালয় পর্বতে। যমুনা নদী গোয়ালন্দের কাছে এসে পদ্মানদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। ধলেশ্বরী যমুনার প্রধান শাখানদী। ধরলা, তিস্তা, করতোয়া ও আত্রাই যমুনার উপনদী।

কর্ণফুলি : কর্ণফুলি নদীর জন্ম আসামের লুসাই পাহাড়ে। রাঙ্গামাটি ও চট্টগ্রামের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে এ নদী বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। এ নদীর দৈর্ঘ্য প্রায় ২৭৪ কিলোমিটার। কর্ণফুলি নদী অত্যন্ত খরস্রোতা। এ নদীর উপর বাঁধ দিয়েই নির্মিত হয়েছে কাপ্তাই পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্র। এ নদীর তীরেই গড়ে উঠেছে কর্ণফুলি কাগজ ও রেশম শিল্প-কারখানা। কর্ণফুলির প্রধান উপনদী হচ্ছে হালদা, বোয়ালখালী ও কাসালং।

ব্রহ্মপুত্র : হিমালয় পর্বতের কৈলাস শৃঙ্গের মানস সরোবরে এ নদীর উৎপত্তি। তিব্বতের পূর্ব দিক ও আসামের পশ্চিম দিক দিয়ে এ নদী প্রবাহিত হয়ে কুড়িগ্রাম জেলার মধ্য দিয়ে এ নদী বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। বংশী ও শীতলক্ষ্যা ব্রহ্মপুত্রের প্রধান শাখা নদী। ধরলা ও তিস্তা এর উপনদী।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে নদ-নদীর প্রভাব : নদীর সঙ্গে আমাদের জীবন গভীরভাবে জড়িত। আমাদের যাতায়াতের অন্যতম প্রধান মাধ্যম হচ্ছে নদীপথ। নদীকে ঘিরে গড়ে উঠেছে এদেশের অনেক ব্যবসাবাণিজ্যকেন্দ্র। আমাদের কৃষিক্ষেত্র অনেকাংশেই নদীর উপর নির্ভরশীল। এদেশের কবি-সাহিত্যিক ও শিল্পীরা নদীকে নিয়ে সৃষ্টি করেছেন অসংখ্য সাহিত্যকর্ম ।

নদ-নদীর উপকারিতা : বাংলাদেশকে সবুজে-শ্যামলে ভরে তোলার পেছনে নদ-নদীর ভূমিকা অপরিসীম। নদীর পানিতে বয়ে আসা পলি প্রাকৃতিকভাবে আমাদের মাটিকে উর্বর করেছে। আমাদের কৃষির অগ্রগতিতে তাই নদীর ভূমিকা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। কৃষিক্ষেত্র ছাড়াও নদীগুলো মিঠা পানির মাছের অন্যতম উৎস। নদীতে মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করে অসংখ্য মানুষ। দেশীয় প্রয়োজন মিটিয়েও মাছ বিদেশে রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা হয়। এছাড়া পরিবহন-সংক্রান্ত কাজেও নদীকে ব্যবহার করা হয়। একশ্রেণির মানুষ এ কাজ করেই তাদের জীবিকা নির্বাহ করে।

নদ-নদীর অপকারিতা : নদীর কিছু অপকারিতাও আমাদের চোখে পড়ে। বর্ষাকালে নদীগুলো ফুলে-ফেঁপে ওঠে। তখন বন্যা দেখা দেয়। এছাড়া নদীর প্রবল স্রোতে ভাঙন শুরু হয়। কখনও কখনও কোনো কোনো গ্রাম ভাঙতে ভাঙতে নদীর মাঝে সম্পূর্ণ হারিয়ে যায়। এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয় মানুষের ঘরবাড়ি, জমিজমা, গাছপালা, গবাদিপশু ও গৃহসামগ্রী। অনেক সময় নদীর প্রবল স্রোতে মানুষের জীবনহানিও ঘটে। এক গবেষণায় দেখা গেছে, বাংলাদেশে প্রতিবছর প্রায় দশ লক্ষ মানুষ নদীভাঙনের শিকার হয়।

উপসংহার : নদ-নদী বাংলাদেশকে করেছে সমৃদ্ধ। এদেশকে ঘিরে রেখেছে চারদিক থেকে। নদ-নদীগুলো এদেশের গৌরব। তবে বর্তমানে সে গৌরব ম্লান হতে চলেছে। নদীগুলো ভরাট হয়ে হারিয়ে ফেলছে তাদের স্বাভাবিক গতিপথ। তাই এ বিষয়ে এখনই আমাদের কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া উচিত।

৩ জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম

ভূমিকা : 'থাকব না ক বদ্ধ ঘরে/ দেখব এবার জগৎটাকে
কেমন করে ঘুরছে মানুষ/ যুগান্তরের ঘূর্ণিপাকে।'

(সংকল্প : কাজী নজরুল ইসলাম)

অনেক খ্যাতিমান কবির কবিতায় বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়েছে। তবে কাজী নজরুল ইসলাম তাঁদের মধ্যে ব্যতিক্রম। তিনি বিদ্রোহী কবি, মানবতার কবি, প্রেমের কবি। তিনি আমাদের জাতীয় কবি। বাংলা ভাষা-ভাষী মানুষ বাংলা সাহিত্যে তাঁর অবদান কোনো দিন ভুলবে না।

কবির জন্মপরিচয় : ১৮৯৯ সালের ২৪শে মে (১৩০৬ বঙ্গাব্দের ১১ই জৈষ্ঠ্য) পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম কাজী ফকির আহমদ এবং মাতার নাম জায়েদা খাতুন। ছেলেবেলায় নজরুলের নাম ছিল দুঃখু মিয়া।

কবির শিক্ষাজীবন : ছোট থেকেই নজরুল ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী। গ্রামের মক্তব্য থেকে তিনি প্রাইমারি পাস করেন। এরপর তিনি ময়মনসিংহের ত্রিশালের দরিরামপুর হাইস্কুলে কিছুকাল পড়ালেখা করেন। তারপর তিনি ভর্তি হন বর্ধমান জেলার রানীগঞ্জ সিয়ারসোল রাজ হাইস্কুলে। এখানে দশম শ্রেণির ছাত্র থাকা অবস্থায় তিনি ৪৯ নম্বর বেঙ্গালি রেজিমেন্টে সৈনিক হয়ে প্রম মহাযুদ্ধে যোগদান করেন। নজরুলের প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনার এখানেই ইতি ঘটে।

কবির কর্মজীবন : নজরুল বারো বছর বয়সে লেটোর গানের দলে যোগ দেন। সেখান থেকে তিনি সামান্য কিছু রোজগার করতেন। এরপর তিনি আসানসোলের এক রুটির দোকানে মাসিক এক টাকা বেতনে চাকরি নেন। বাঙালি পল্টনে সৈনিক হিসেবে কিছুকাল অতিবাহিত করার পর কাব্যসাধনা তিনি পুরোপুরি নিয়োজিত হন। সাংবাদিক হিসেবেও তিনি যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় নবযুগ, লাঙল ও ধূমকেতু পত্রিকা। পত্রিকাগুলো যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়েছিল।

কবির কাব্যপ্রতিভা : ১৯২০ সাল থেকে নজরুল পুরোপুরি সাহিত্য রচনায় মনোনিবেশ করেন। তাঁর প্রথম প্রকাশিত কবিতার নাম 'মুক্তি'। কিন্তু যে কবিতা তাঁকে খ্যাতি এনে দেয় তার নাম 'বিদ্রোহী'। পরবর্তীকালে তিনি বিদ্রোহী কবি হিসেবে সমধিক পরিচিতি লাভ করেন। 'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতাটি রচনা করে তিনি ব্রিটিশ শাসকদের ব্যঙ্গ করেছিলেন। এ কারণে তাঁকে কারাবরণও করতে হয়েছে।

সাহিত্যকীর্তি : কাজী নজরুল ইসলাম খুব অল্প সময় সাহিত্য সাধনার সুযোগ পেয়েছিলেন। তার মধ্যেই তিনি রচনা করেছিলেন অগ্নিবীণা, বিষের বাঁশী, চক্রবাক, দোলনচাঁপা, ফণিমনসা প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ ও কুহেলিকা, মৃত্যুক্ষুধা প্রভৃতি উপন্যাস। তিনি প্রায় দুহাজারের মতো গান রচনা করেছেন। তাঁর গানের সুরের বৈচিত্র্য আমাদের মুগ্ধ করে। মানুষ এখনও শ্রদ্ধা সহকারে তাঁর গানগুলো শোনে।

সংবর্ধনা, সম্মাননা ও পুরস্কার : ১৯২৯ সালে কলকাতা অ্যালবার্ট হলে নজরুলকে জাতির পক্ষ থেকে সম্মাননা জানানো হয়। ১৯৩৮ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলনে নজরুলকে সভাপতির পদে সমাসীন করে সম্মান দেখানো হয়। ১৯৪৫ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নজরুলকে 'জগত্তারিণী স্বর্ণপদক' প্রদান করে। ১৯৬০ সালে ভারত সরকার তাঁকে পদ্মভূষণ উপাধি দেয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৭৫ সালে তাঁকে ডি.লিট. উপাধি প্রদান করা হয়। ১৯৭৬ সালে তিনি একুশে পদক লাভ করেন।

কবির অসুস্থতা : ১৯৪২ সালে কবি মস্তিষ্কের পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁকে চিকিৎসার জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পাঠানো হলেও সুস্থ হননি তিনি। এরপর থেকে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি ছিলেন নির্বাক।

কবির বাংলাদেশে আগমন : ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রচেষ্টায় অসুস্থ কবিকে ঢাকায় আনা হয়। তাঁকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রদান করা হয় এবং জাতীয় কবির মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করা হয়।

মৃত্যু : বাংলাদেশে অবস্থানকালে ১৯৭৬ সালের ২৯শে আগস্ট কবি মৃত্যুবরণ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদ প্রাঙ্গণে তাঁকে পূর্ণ সামরিক মর্যাদায় দাফন করা হয়। প্রতিবছরই তাঁর জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকীতে তাঁর সমাধিতে সবাই শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে।

উপসংহার : বাঙালির গর্ব নজরুল। বাঙালির প্রিয় কবি নজরুল। তিনি তাঁর সৃষ্টির দ্বারাই বাংলা সাহিত্যে অমরত্ব পেয়েছেন। বাঙালি জাতি চিরকাল তাঁকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে। তাঁর সাহিত্য যুগ যুগ ধরে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ

করতে আমাদের প্রেরণা জোগাবে। নজরুল শুধু একটি সময়ের কবি নন। তিনি সব সময়ের সব মানুষের কবি।

৪ কী ধরনের বই আমার পড়তে ভালো লাগে

ভূমিকা : গল্পকার ও ঔপন্যাসিক মাক্সিম গোর্কি বলেছেন, 'আমার মধ্যে উত্তম বলে যদি কিছু থাকে তার জন্য আমি বইয়ের কাছে ঋণী।' সত্যিকার অর্থেই বই মানুষের মধ্যে ইতিবাচক ভাবনার জন্ম দেয়। মানুষের চেতনাকে জাগ্রত করে। তাইতো বই আমার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু।

আমার বই পড়ার শুরুর কথা : মায়ের কাছ থেকে বর্ণমালা শেখার পর পাঁচ বছর বয়সে আমাকে স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হয়। স্কুলের পাঠ্যবই তখন আমার সঙ্গী হয় । কিন্তু তার অনেক আগে থেকেই আমি বই পড়তাম। ছোটবেলায় 'ঠাকুরমার ঝুলি' আমাকে খুব আনন্দ দিত। এ গল্পগুলো আমি নিজে পড়ে যতটা আনন্দ পেতাম, তার চেয়ে অনেক বেশি আনন্দ পেতাম শুনে। এছাড়া ঈশপের গল্প, মোল্লা নাসিরউদ্দীনের গল্প, বীরবলের গল্প ও গোপাল ভাঁড়ের গল্প আমার পড়তে ভালো লাগত। কিন্তু এখন আমি এ রকম বই পড়ি না। গোয়েন্দা গল্প, মুক্তিযুদ্ধের গল্প ছাড়াও আরও নানারকমের গল্পের বই এখন আমার নিত্যসঙ্গী।

আমার ভালো লাগার বই : গোয়েন্দা গল্প পড়তে আমার সবচেয়ে ভালো লাগে। গোয়েন্দা চরিত্রগুলোর মধ্যে 'ফেলুদা' আমার সবচেয়ে প্রিয়। অমর এ চরিত্রের স্রষ্টা সত্যজিৎ রায়। ফেলুদাকে নিয়ে সত্যজিৎ রায় অনেকগুলো গল্প লিখেছেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো জয় বাবা ফেলুনাথ, কলকাতায় ফেলুদা, বাক্স

রহস্য, সোনার কেল্লা, রয়েল বেঙ্গল রহস্য, শেয়াল রহস্য ত্যাদি। গল্পগুলো যখন আমি পড়ি, তখন আমার মধ্যে এক রোমাঞ্চকর অনুভূতির সৃষ্টি হয়। মাঝে মাঝে আমি নিজেকে গল্পের চরিত্র হিসেবেও ভাবতে শুরু করি। ফেলুদার সঙ্গে থাকা তপেসের চরিত্র এক্ষেত্রে আমাকে খুবই আকর্ষণ করে। আর জটায়ুর চরিত্র আমাকে আনন্দ দেয়। তবে ফেলুদার চরিত্র এককথায় অসাধারণ। গল্পগুলো যখন আমি পড়ি, তখন সময় কোন দিক দিয়ে কেটে যায় আমার মনেই থাকে না। সব কাজ ভুলে গল্পগুলোর মধ্যে আমি নিজেকে ডুবিয়ে রাখি। যতক্ষণ একটি গল্প পড়া শেষ না হয়, ততক্ষণ আমি বই ছেড়ে উঠতে পারি না। এক কল্পনার জগতের মধ্যে গল্পগুলো আমাকে টেনে নিয়ে যায়।

আমার অন্যান্য বইয়ের সংগ্রহ : গোয়েন্দা গল্প ছাড়াও আমার সংগ্রহে মুক্তিযুদ্ধের বই, ইতিহাসের বই, সায়েন্স ফিকশন, গণিতের বই ও ম্যাজিক শেখার বই রয়েছে। গোয়েন্দা গল্প পড়ার পাশাপাশি এ বইগুলো পড়তেও আমার ভালো লাগে।

বই পড়ে আমার প্রাপ্তি : আনন্দ পাওয়ার জন্যই আমি মূলত বই পড়ি। তবে গোয়েন্দা গল্পগুলো আমাকে যুক্তিবাদী ও বিজ্ঞানমনস্ক হতে সাহায্য করেছে। আমার চারপাশের অজানা জগৎ সম্পর্কে আমাকে ধারণা দিয়েছে বই। বিশ্বের বিভিন্ন বিষয়ের সঙ্গে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে বই। বই পড়ে আমি মানুষের মন ও তার চিন্তা সম্পর্কে বিভিন্ন ধারণা পেয়েছি। ভবিষ্যতে এ জ্ঞান আমাকে পথ চলতে সাহায্য করবে। আমার পরিবার, বিদ্যালয় ও শিক্ষদের কাছে আমাকে আদরণীয় করেছে বই।

উপসংহার : বই আমাকে সবসময় সৎ পথে চলতে সাহায্য করে। আমার মন খারাপ হলে বন্ধুর মতো আমার পাশে থেকে বই আমাকে সাহায্য করে। বই পড়ে আমি মানুষের জন্য ভালো কিছু করার প্রেরণা পাই। জ্ঞান ও বুদ্ধিতে মানুষকে শাণিত হতে হলে বইয়ের কোনো বিকল্প নেই। তাই প্রত্যেকেরই বই পড়া উচিত।

৫ আমার চারপাশের প্রকৃতি

ভূমিকা : সবুজের চাদরে ঢাকা আমাদের এই দেশ। এদেশের প্রাকৃতিক শোভা আমাদের মুগ্ধ করে। এদেশের প্রকৃতির রূ প বড় বিচিত্র। এদেশের নদী, মাঠ, অরণ্য, আকাশ, পাহাড় দেখে আমরা পুলকিত হই। আমাদের মাতৃভূমি তার অপরূ প ঐশ্বর্য ও সম্পদে অনন্য।

চারপাশের প্রকৃতি : আমার জন্ম ও বেড়ে ওঠা গ্রামের পরিবেশে। এখানকার মাঠ, ঘাট, বন ও প্রান্তর সবকিছুর সঙ্গেই আমার আত্মার সম্পর্ক। তাই এ প্রকৃতি আমার কাছে অন্য সব স্থানের চেয়ে অনেক বেশি আপন।

বন-বনানী : আমার চারদিকে সবুজের সমারোহ। যেদিকে তাকাই সেদিকেই ঘন সবুজ। আম, জাম, কাঁঠাল, তাল, নারিকেল, বট, শাল, সেগুন, মেহগনি, কড়ইসহ আরও কত গাছ। এসব গাছগাছালি মিলে চারপাশে একটা বনের মতো সৃষ্টি হয়েছে। কবি জসীমউদ্‌দীনের ভাষায় :

বনের পরে বন চলেছে বনের নাহি শেষ,
ফুলের ফলের সুবাস ভরা এ কোন পরীর দেশ

বর্ষার দিনে যখন এ বনে বৃষ্টি আসে, তখন মনে হয় প্রকৃতি যেন তার দুহাত বাড়িয়ে আমাকে ডাকছে। আবার শীতের দিনে যখন গাছগুলোর পাতা ঝরে পড়ে, তখন প্রকৃতিকে অসহায় মনে হয়। বসন্তে নতুন পাতা এলে গাছগুলো নতুন সাজে সেজে ওঠে। শুধু বড় গাছগুলোই নয়, ছোট গাছগুলোও অপরূ প শোভা সৃষ্টি করে চারপাশে।

মাঠ-প্রান্তর : বনের দিক থেকে চোখ ঘোরাতেই ধানখেত সামনে এসে পড়ে। যখন তার উপর দিয়ে বাতাস বয়ে যায়, তখন মনে হয় সবুজের সমুদ্র বুঝি হাতছানি দিয়ে ডাকছে। পাটক্ষেতের পাট গাছগুলোও বেশ বড় হয়েছে। সেদিকে তাকিয়ে মনটা আনন্দে ভরে যাচ্ছে। গমখেতের গমগুলো পেকে

উঠেছে। তার উপর যখন সূর্যের আলো পড়ছে, তখন সোনালি আলোয় চারদিক ভরে যাচ্ছে। এ মাঠেই শীতের সময় ফোটে সর্ষেফুল। তখন চারদিক হলুদ হয়ে ওঠে। মৌমাছির দল এসে তখন সেখান থেকে মধু সংগ্রহ করে।

জলাশয় : মাঠ পার হয়ে রাস্তায় আসতেই একটা বড় পুকুর চোখে পড়ে। পুকুরের চারিদিকে নারিকেল ও কলাগাছ লাগানো। পানি কাচের মতো স্বচ্ছ। তার এক কোণে ফুটে আছে শাপলা ফুল। মাঝে মাঝে একটা দুটো মাছ লাফ দিচ্ছে এদিক থেকে ওদিকে। দুটো ছেলে অনেক উঁচু একটা গাছের ডাল থেকে পুকুরের পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে ঢেউ বয়ে গেল। পুকুরপাড় দিয়ে সামনে আসতেই একটা বিল চোখে পড়ে। বিলে অনেক পানি। জেলেরা সেখানে জাল দিয়ে মাছ ধরছে। বিলের পানিতে হালকা হালকা ঢেউ। তবে বর্ষায় এমন থাকে না। তখন অনেক বড় বড় ঢেউ এপার থেকে ওপার অবধি বয়ে যায়। বিলের উপরে কিছু নৌকা ভেসে চলেছে। কিছু মানুষ বিলের এপার থেকে ওপার যাচ্ছে।

পশুপাখি : গাঙ শালিক, বক, বেলে হাঁস, মাছরাঙা ছাড়াও বিলের ধারে রয়েছে আরও অনেক পাখি। রাতে মাঝে মাঝে দু-একটা মেছো বাঘ বিলের ধারে দেখা যায়। এছাড়া সবুজ ধানখেতে ও গাছের মাথায় ছুটে আসে টিয়া, চড়ুই, শালিক, ঘুঘু, বুলবুলি, ফিঙ্গে, দোয়েলসহ আরও অনেক পাখি। ঘন সবুজ গাছের আড়ালে মাঝে মাঝে দু-একটা শেয়াল দেখা যায়। তবে সাপ, বেজি, বনবিড়াল সেখানকার স্থায়ী বাসিন্দা।

রাতের আকাশ : রাতের আকাশ দেখে মনে হয় এ যেন স্বর্গের লীলাভূমি। অগণিত তারা রাতের আকাশকে উজ্জ্বল করে তোলে। পূর্ণিমার সময় চাঁদের আলোয় ঝলমল করে চারপাশ। আবার অমাবস্যার রাতে চারদিকে কালো অন্ধকারে ভরে যায়। তখন জোনাকির আলোয় মানুষ পথ চিনে ঘরে ফেরে।

সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত : প্রকৃতি জেগে ওঠে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে। কাকডাকা ভোরে মানুষ ঘুম থেকে উঠে আপন কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। সারাদিন পর আকাশ রাঙিয়ে যখন সূর্যাস্ত হয়, তখন প্রকৃতির কোলে যে যার স্থানে ফিরে যায়।

উপসংহার : আমার চারপাশের প্রকৃতি চোখজুড়ানো ও মন ভুলানো। তাই যে একবার এ প্রকৃতির মাঝে আসে, সে আর এখান থেকে যেতে চায় না। খুঁজতে চায় না অন্য কোনো রূ প। কবি জীবনানন্দের ভাষায় :

বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি
তাই আমি পৃথিবীর রূ প খুঁজিতে যাই না আর

এদেশের প্রকৃতি ও এর সৌন্দর্য আমার গর্ব। আমি আমার দেশকে খুব ভালোবাসি।

৬ আমার দেখা একটি মেলা

সূচনা : মেলা শব্দটি শোনার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনে আনন্দের অনুভূতি সৃষ্টি হয়। আক্ষরিকভাবে মেলা শব্দের অর্থ হলো 'মিলন'। মেলায় পরিচিতজনদের সঙ্গে দেখা হয় এবং ভাববিনিময় হয়। একের সঙ্গে অন্যের সংযোগ ঘটে মেলায়। আমাদের সংস্কৃতিতে মেলার গুরুত্ব অসীম।

মেলার প্রচলন : অতি প্রাচীনকাল থেকেই বাংলাদেশে মেলার প্রচলন ছিল। তবে তখন মেলার আয়োজন হতো সুনির্দিষ্ট কিছু স্থানে এবং বৃহৎ পরিসরে। বর্তমানে দেশের প্রায় সব স্থানেই মেলা হয়। কোনো কোনোটির আয়োজন অনেক বড়, আবার কোনোটির ক্ষুদ্র। তবে মেলার আনন্দ এখন আগের মতোই রয়েছে।

মেলার উপলক্ষ : আমাদের দেশে বেশিরভাগ মেলা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত হয়। হিন্দুদের দুর্গাপূজা, রথযাত্রা, দোল উৎসব, জন্মাষ্টমী প্রভৃতি উপলক্ষে মেলা অনুষ্ঠিত হয়। মুসলমানদের ১০ই মহরমকে কেন্দ্র করে মেলা অনুষ্ঠিত হয়। বৌদ্ধদের বৌদ্ধপূর্ণিমা উপলক্ষেও মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া চৈওসংক্রান্তি ও বাংলা নববর্ষে মেলা অনুষ্ঠিত হয়। আমার দেখা মেলার উপলক্ষ ছিল পহেলা বৈশাখ বা বাংলা নববর্ষ।

মেলার স্থান : সাধারণত খোলা কোনো বৃহৎ স্থানে, যেখানে মানুষের চলাচল রয়েছে, তেমন স্থানেই মেলা অনুষ্ঠিত হয়। অনেক সময় স্কুলমাঠেও মেলা অনুষ্ঠিত হয়। তবে আমি যে মেলাটি দেখেছি, সেটি বসেছিল নদীর ধারের একটি বৃহৎ বটগাছের নিচে।

মেলার প্রস্তুতি : পহেলা বৈশাখ বা বাংলা নববর্ষ বাঙালির সবচেয়ে আনন্দের দিন। এদিনকে উপলক্ষ করে মেলার প্রস্তুতিও ছিল বিশাল। অস্থায়ীভাবে বটগাছের চারদিকে দোকানপাট তৈরি করা হয়। একদিকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও যাত্রাপালার জন্য একটি বড় মঞ্চ তৈরি করা হয়। কিছু কিছু মানুষ মূল স্থানে জায়গা না পেয়ে রাস্তার পাশে তাদের জিনিসপত্র নিয়ে বসার প্রস্তুতি নেয়। মঞ্চের চারদিকে মাইক লাগানো হয়।

মেলার চিত্র : পহেলা বৈশাখ বা নববর্ষ শুরুর সঙ্গে সঙ্গে মেলা শুরু হয়। স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মেলার সূচনা করেন। মেলা শুরু হতেই এতে জনস্রোত দেখা যায়। যে দোকানগুলো কাল পর্যন্ত খালি ছিল তা আজ কানায় কানায় নানা দ্রব্যসামগ্রীতে ভরে যায়। মানুষ রঙিন পোশাক পরে মেলায় প্রবেশ করে। ছোট ছেলে-মেয়েদের চোখে মুখে আনন্দের ঝলক দেখা যায়। বৃদ্ধরাও ভিড় এড়িয়ে মেলায় প্রবেশ করতে থাকে। মেলার চারদিকে প্রচণ্ড ভিড় লক্ষ করা যায়। প্রতিটি দোকানে মানুষ তাদের পছন্দের ও প্রয়োজনের জিনিসপত্র কিনতে শুরু করে। ছোট ছেলেমেয়েরা ভিড় করে মাটির খেলনা, বেলুন, বাঁশি আরও নানা জিনিসের দোকানে। নারীরা ভিড় করে প্রসাধন সামগ্রী ও চুড়ির দোকানে। এ ছাড়া কাপড়ের দোকানেও ভিড়

লক্ষ করা যায়। পুরুষেরা তাদের পোশাকের দোকানের সামনে ভিড় করে। মেলার এদিকে মিষ্টির দোকান লক্ষ করা যায়। এখানে গরম জিলিপি কিনতে সবাই ভিড় করে। এছাড়া ছোলাভাজা, বাদামভাজা, পাঁপরভাজা, ভুট্টার খই, কনক ধানের খই, মুড়কি, বাতাসা হাওয়াই মিঠাই ও নানা রকমের মিষ্টি পাওয়া যায় মেলায়। সবাই এগুলো খেতে খেতে মেলায় ঘুরে বেড়ায়। মেলার একদিকে একটি লোক সাপের খেলা দেখাচ্ছিল। তা দেখতে ভিড় করে অসংখ্য মানুষ। এছাড়া ছোট খাটো একটা সার্কাসের আয়োজনও ছিল।

মেলার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান : সন্ধ্যার সময় মেলায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। স্থানীয় শিল্পীদের গান পরিবেশনের পর শুরু হয় যাত্রাপালা। মঞ্চে ভেলুয়া সুন্দরীর পালা পরিবেশন করা হয়। যাত্রাপালায় ভেলুয়া সুন্দরীর জীবনের দুঃখ দেখে অনেকেই আবেগাক্রান্ত হয়ে পড়েন। পরিশেষে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে কর্তৃপক্ষ মেলার ইতি টানেন।

মেলার তাৎপর্য : মেলায় মানুষের সম্প্রীতির এক বন্ধন তৈরি হয়। স্থানীয়ভাবে তৈরি জিনিসের একটি প্রদর্শনী হয় মেলাতে। মানুষ তার নিজস্ব সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে পারে মেলায় এসে। শুধু তাই নয়, এখানে অর্থনৈতিক বিষয়ও যুক্ত থাকে। একদল মানুষের উপার্জনের মূল উৎস হলো মেলা। এছাড়া ক্রেতারাও তাদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ক্রয় করার জন্য মেলার উপর নির্ভর করে। অনেকে মেলাকে ঘিরে বছরের বিকিকিনির বড় পরিকল্পনাও করে থাকে।

উপসংহার : বাঙালি সংস্কৃতির বিরাট অংশজুড়ে রয়েছে মেলা। মেলা সাধারণ কোনো আয়োজন নয়। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে আমাদের প্রা, ইতিহাস ও ঐতিহ্য। মেলার মধ্য দিয়ে একশ্রেণির জীবন ও জীবিকা গড়ে উঠেছে। শুধু গ্রামেই নয়, শহরেও মেলা আনন্দের উৎস। তাইতো মেলার দিনে মানুষ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে। মানুষকে আনন্দদানের উদ্দেশ্যে সমবেত করতে মেলার কোনো বিকল্প নেই। তাই তো মেলা আজও আমাদের কাছে এত আকর্ষণীয়।

৭ শহিদ মিনার

ভূমিকা : 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি
আমি কী ভুলিতে পারি
ছেলে হারা শত মায়ের অশ্রব গড়ায়ে ফেব্রুয়ারি
আমি কী ভুলিতে পারি'

প্রতিবছর একুশে ফেব্রুয়ারিতে প্রভাতফেরির এ গান গেয়ে আমরা শহিদ মিনারে যাই। সেখানে ফুল দিয়ে ভাষাশহিদদের প্রতি আমরা শ্রদ্ধা জানাই। শহিদ মিনার এদিন ফুলে ফুলে ছেয়ে যায়। আমাদের মনে করিয়ে দেয় মায়ের ভাষা আমাদের কাছে কত আপন। এ ভাষার মর্যাদা রক্ষা করতেই বাংলার ছেলেরা রাজপথে প্রাণ দিয়েছিল। তাদের স্মৃতি রক্ষার্থেই নির্মিত হয়েছে শহিদ মিনার।

শহিদ মিনার সৃষ্টির পটভূমি : ১৯৫২ সালের ২৬শে জানুয়ারি নিখিল পাকিস্তান মুসলিম লীগের ডাকা অধিবেশনে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন ঘোষণা করেন 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা।' এ ঘোষণার প্রতিবাদে ৪ঠা ফেব্রুয়ারি প্রতিবাদ দিবস, ১১ই ও ১৩ই ফেব্রুয়ারি পতাকা দিবস পালিত হয়। সেখান থেকে ঘোষণা দেয়া হয় ২১শে ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা দিবস পালিত হবে। এ ঘোষণার প্রেক্ষিতে শাসকগোষ্ঠী ২১শে ফেব্রুয়ারিতে সকল প্রকার সভা, মিছিল, মিটিং ও শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ করার জন্য ১৪৪ ধারা জারি করে। কিন্তু ছাত্রজনতা এ বাধাকে অতিক্রম করে মিছিল নেয়ে এগিয়ে যায় সামনের দিকে। ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনে মিছিলটি আসতেই পুলিশ তার উপর গুলি চালায়। পুলিশের গুলিতে নিহত হন সালাম, জব্বার, রফিক, বরকত, শফিউরসহ আরও অনেকে। তাঁদের স্মৃতি রক্ষার্থেই গড়ে ওঠে স্মৃতির শহিদ মিনার।

প্রথম শহিদ মিনার : ২১শে ফেব্রুয়ারির শহিদদের স্মৃতি রক্ষার্থে ২২শে ও ২৩শে ফেব্রুয়ারি অক্লান্ত পরিশ্রম করে ছাত্রজনতা একটি শহিদ মিনার তৈরি করে। এ কাজে অংশ নেয় তিন শ ছাত্র ও দুজন রাজমিস্ত্রি। প্রম শহিদ মিনার তৈরির জন্য সাইদ হায়দার একটি নকশা প্রণয়ন করেন। তাঁর নকশায় শহিদ মিনারের উচ্চতা নয় ফুট থাকলেও তৈরির পর এটির উচ্চতা হয় এগারো ফুট। শহিদ শফিউরের পিতা ২৪শে ফেব্রুয়ারি এটি উদ্বোধন করেন। কিন্তু কয়েক দিন পরই পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী এ শহিদ মিনারটি ভেঙে ফেলে। তবে বাঙালির হৃদয় থেকে তারা এ মিনারের স্মৃতি মুছে দিতে পারেনি। কবি আলাউদ্দীন আল আজাদের ভাষায় :

ইটের মিনার ভেঙেছে ভাঙুক
একটি মিনার গড়েছি আমরা চার–কোটি পরিবার

আজকের শহিদ মিনার : বর্তমান শহিদ মিনারটির নকশা করেন স্থপতি হামিদুর রহমান। পরবর্তীকালে শহিদ মিনারটি আরও সংস্কার করা হয়। বর্তমানে ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনে আমরা যে শহিদ মিনারটি দেখি সেটিই চূড়ান্ত হামিদুর রহমানের নকশার পরিপূর্ণ রূ প। প্রতিবছর মানুষ এ মিনারের সামনেই ভাষাশহিদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করে। বর্তমানে এ শহিদ মিনারের আদলেই বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে শহিদ মিনার নির্মাণ করা হয়েছে।

শহিদ মিনারের তাৎপর্য : শহিদ মিনারের সিনার ও তার স্তম্ভগুলো মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার তথা মা ও তাঁর শহিদ সন্তানের প্রতীক। মাঝখানের সবচেয়ে উঁচু স্তম্ভটি মায়ের প্রতীক। চারপাশের ছোট চারটি স্তম্ভ সন্তানের প্রতীক। যারা তাদের বুকের রক্ত ঢেলে বাংলা ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে।

আমাদের জীবনে যা কিছু সুন্দর, যা কিছু শুভ তার সঙ্গে শহিদ মিনারের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। এটি শুধু একটি মিনার নয়, এটি আমাদের প্রেরণার প্রতীক। শুধু ভাষা আন্দোলন নয়, মুক্তিযুদ্ধেও শহিদ মিনার আমাদের প্রেরণা যুগিয়েছে। আমাদের যুদ্ধ জয়ের অন্যতম প্রেরণা একুশে ফেব্রুয়ারি। আমরা যখনই অন্যায়ের শিকার হই, তখনি শহিদ মিনার তার প্রতিবাদ করার জন্য আমাদের প্রেরণা জোগায়।

শহিদ মিনার ও আমাদের সংস্কৃতি : আমাদের সংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে শহিদ মিনারের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। দেশে যখনই কোনো অন্যায় সংঘটিত হয়, তখনি শহিদ মিনারের সামনে থেকে তার প্রতিবাদ করা হয়। বিভিন্ন জাতীয় দিবসের অনুষ্ঠান হয় শহিদ মিনার প্রাঙ্গণে। এমনকি কোনো জাতীয় বা সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বের মৃত্যুর পর তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য শহিদ মিনার প্রাঙ্গণে রাখা হয়।

উপসংহার : শহিদ মিনার আমাদের প্রেরণার উৎস। আমরা শহিদ মিনারের দিকে তাকিয়ে আমাদের সমৃদ্ধ অতীতের কথা ভাবি। আর বর্তমান প্রজন্মের কাছে গর্ব করে সে কথাগুলো বলি। আজ ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের মর্যাদা পেয়েছে। ভাষার জন্য আমাদের আত্মদানের তিহাস ছড়িয়ে গেছে বিশ্বব্যাপী। শহিদ মিনার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে। বাঙালির সঙ্গে সঙ্গে গোটা পৃথিবীর মানুষ আজ শহিদ মিনারের সামনে দাঁড়িয়ে ভাষা শহিদদের অবদানকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে।

৮ শৃঙ্খলাবোধ

সূচনা : 'Man is bron Free, but everywhere he is in chain' –মহান দার্শনিক রুশোর এ বক্তব্যের অর্থ হলো, মানুষ মুক্তভাবে এ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করলেও প্রতিপদেই সে শৃঙ্খলিত। এ পৃথিবীর সবকিছুই প্রকৃতির নিয়মে বাঁধা। প্রকৃতির নিয়মের সামান্যতম ব্যত্যয় ঘটলেই মানবজীবনে বিপর্যয় নেমে আসে। নিয়ম মেনেই প্রতিদিন সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত হয়। আসে দিন আসে রাত।

শৃঙ্খলাবোধের স্বরূপ : শৃঙ্খলাবোধ বলতে সাধারণত জীবনযাপনে নিয়মনীতি, মূল্যবোধ ও আর্দশের প্রতি অনুগত থাকাকে বোঝায়। সমাজজীবনে কোনো মানুষই আপন খেয়াল অনুযায়ী চলতে পারে না। নিয়ন্ত্রিত জীবনযাপনই তাকে লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে পারে। প্রচলিত নিয়ম-কানুন ও রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত থেকে জীবন পরিচালনাই হলো শৃঙ্খলাবোধ।

শৃঙ্খলাবোধের গুরুত্ব : মানবজীবনের জন্য শৃঙ্খলাবোধের গুরুত্ব অপরিসীম। শৃঙ্খলার কারণেই মানবজীবনে সুখ-শান্তি নেমে আসে। স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তি কখনোই সুখী হতে পারে না। সে শুধু নিজেরই নয়, সমাজেরও শান্তি নষ্ট করে। শৃঙ্খলাহীন জীবন লক্ষ্যহীন নৌকার মতো পানিতে ভেসে বেড়ায়। তার কোনো ঠিকানা থাকে না। মানুষ যদি নিজের ভেতর শৃঙ্খলা ধারণ করতে না পারে, তবে সমাজেও নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা নেমে আসে। তাই সুখী জীবনযাপনের জন্য শৃঙ্খলার কোনো বিকল্প নেই।

শৃঙ্খলাচর্চার সময় : শৈশব হলো শৃঙ্খলাচর্চার উপযুক্ত সময়। নিয়ম মানেই শৃঙ্খলা। এটি রপ্ত করে চর্চার মাধ্যমে জীবনকে সুখী করা যায়। মানবজীবনে সফলতার চাবিকাঠি হলো শৃঙ্খলা। শৃঙ্খলার ফলেই মানুষ সমাজের আচরণবিধি মেনে চলে এবং সফলভাবে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়।

ছাত্রজীবনে শৃঙ্খলা : ছাত্রজীবনে শৃঙ্খলা বিশেষ গুরুত্ব পালন করে। কারণ এ সময়েই ভবিষ্যৎ জীবনের বীজ রোপিত হয়। শৃঙ্খলাবোধ একজন ছাত্রকে দায়িত্বশীল করে তোলে। পড়াশোনার প্রতি তার মনোযোগ বৃদ্ধি করে। ভবিষ্যতে শৃঙ্খলাবোধই তাকে সুনাগরিক হতে সাহায্য করে।

মানবজীবনে শৃঙ্খলা : সৃষ্টির সেরা জীব মানুষ। অন্যান্য প্রাণী থেকে মানুষ উন্নত, কারণ সে নিয়মবদ্ধ জীবনযাপন করে। জীবনকে সার্থক করতে শৃঙ্খলার কোনো বিকল্প নেই। শৃঙ্খলাবদ্ধ মানুষ শুধু নিজের বা পরিবারের জন্য নয়, রাষ্ট্রের জন্যও সম্পদ। মানবজীবনে লক্ষ্যকে জয় করতে শৃঙ্খলার কোনো বিকল্প নেই।

সমাজজীবনে শৃঙ্খলা : আদিমযুগ থেকেই মানুষের সমাজে কিছু নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে চলা হয়। বর্তমান যুগেও নিয়ম শৃঙ্খলা সমাজের জন্য অপরিহার্য। সত্যিকার অর্থে নিয়ম-শৃঙ্খলা ছাড়া কোনো সমাজ চলতে পারে না। নিয়মবদ্ধভাবেই সমাজের সমস্ত আচার-অনুষ্ঠান পরিচালিত হয়। শৃঙ্খলাই সমাজকে সুন্দর ও সার্থক করে তোলে। অনিয়ম বা বিশৃঙ্খলা সমাজকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যায়। সমাজকে সুন্দর ও সার্থক করে গড়ে তোলার জন্য শৃঙ্খলার কোনো বিকল্প নেই।

শৃঙ্খলা সৃষ্টির উপায় : পরিবার শৃঙ্খলা সৃষ্টির প্রধান কেন্দ্র। একটি শিশু পরিবার থেকেই প্রম শৃঙ্খলা শেখে। দ্বিতীয় পর্যায়ে শিশুর শিক্ষা শুরু হয় বিদ্যালয়ে। শিক্ষক ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শিশুর শৃঙ্খলাবোধকে জাগিয়ে তোলে। উত্তরোত্তর এ শৃঙ্খলাবোধের মধ্য দিয়েই শিশু একদিন উন্নত চরিত্রের মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠে।

শৃঙ্খলার প্রয়োজনীয়তা : মানুষের জীবনের সকল ক্ষেত্রেই শৃঙ্খলার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। শৃঙ্খলা মেনে না চললে জীবনের সর্বক্ষেত্রে মানুষকে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয়। তার জীবনে নেমে আসে পরাজয়ের গ্লানি। খুব সমৃদ্ধ কোনো সমাজ বা প্রতিষ্ঠানও শৃঙ্খলার অভাবে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। অতএব শৃঙ্খলার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

বিশৃঙ্খলার পরিণতি : বিশৃঙ্খলার পরিণতি ভয়াবহ। বিশৃঙ্খলতা শুধু ধ্বংসই ডেকে আনে। যুদ্ধক্ষেত্রে একজন সৈনিক যতই দক্ষ হোক না কেন, তাকে শৃঙ্খলার মধ্যে থাকতে হয়। একমুহূর্তের বিশৃঙ্খলা তাকে এবং তার

সহযোগীদের মারাত্মক অবস্থায় নিয়ে যেতে পারে। খেলার মাঠে কোনো খেলোয়াড় যদি বিশৃঙ্খল আচরণ করে, তবে তার দল নিশ্চিত অর্থে পরাজয়ের সম্মুখীন হয়। বিশৃঙ্খলা এভাবেই মানুষকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যায়।

উপসংহার : একজন মানুষ, একটি সমাজ, একটি জাতি তখনই সভ্য হয়ে ওঠে, যখন তার মধ্যে শৃঙ্খলাবোধ থাকে। পৃথিবীর ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখা যায়, একটি সভ্যতা তথা জাতি তখনই ধ্বংস হয়েছে, যখন তার মধ্যে শৃঙ্খলাবোধের অভাব দেখা গিয়েছে। শৃঙ্খলাহীন মানুষের যেমন কোনো মর্যাদা নেই, তেমনি শৃঙ্খলাহীন জাতিরও কোনো সম্মান নেই। এ কারণেই সমাজজীবনে শৃঙ্খলা এত অত্যাবশ্যকীয়।

৯ সুন্দরবন

ভূমিকা : সুন্দরবন পৃথিবীর একক বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন। এ বনের ৬২ শতাংশ বাংলাদেশের খুলনা জেলায় এবং বাকি ৩৮ শতাংশ পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশপরগনা জেলায় অবস্থিত। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে সুন্দরবন অতুলনীয় এবং জীববৈচিত্র্যে অসাধারণ। সুন্দরবন একটি একক ইকো সিস্টেম। এটি শুধু বাংলাদেশের নয়, বিশ্বের প্রকৃতিপ্রেমিকদের কাছেও একটি আকর্ষণীয় স্থান।

সুন্দরবনের আয়তন ও অবস্থান : সুন্দরবন ২১ ডিগ্রি ত্রিশ ইঞ্চি উত্তর অক্ষাংশ থেকে ৮৯ ডিগ্রি শূন্য ইঞ্চি বা ৮৯ ডিগ্রি পঞ্চান্ন পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। আজ থেকে প্রায় ২০০ বছর পূর্বে সুন্দরবন ১৬,৭০০ বর্গ কি.মি এলাকাব্যাপী বিস্তৃত ছিল। কিন্তু বর্তমানে এর আয়তন সংকুচিত হয়ে গেছে। বর্তমানে এ বনভূমির আয়তন ৬০১৭ বর্গকিলোমিটার। সমস্ত সুন্দরবন দুটি বন বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। এখানে চারটি প্রশাসনিক রেঞ্জ হয়েছে, রয়েছে ১৬ টি ফরেস্ট স্টেশন।

সুন্দরবনের ভূতত্ত্ব, মৃত্তিকা ও জলবায়ু : সুন্দরবনের ভূভাগ হিমালয় পর্বতের ভূমিক্ষয়জনিত জমা পলি থেকে সৃষ্টি। ভূ-বিজ্ঞানীরা এখানকার ভূমি গঠন বিন্যাসে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে সামান্য ঢালের সন্ধান পেয়েছেন। কূপখনন গবেষণা থেকে দেখা যায়, সুন্দরবনের পশ্চিম এলাকা তুলনামূলক স্থির। তবে দক্ষিণ–পূর্ব দিকের একটি অংশ ক্রমেই নিম্নমুখী হচ্ছে। বাংলাদেশের অভ্যন্তরের তুলনায় সুন্দর বনের মাটি একটু আলাদা শৃঙ্খলাবোধ ধরনের। জোয়ার ভাটার কারণে এখানকার পানিতে জলাবদ্ধতা ও লবণাক্ততা বেশি। এখানকার মাটি পলিযুক্ত দোঁ-আশ। সুন্দরবনের বার্ষিক গড় তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩১ ডিগ্রি এবং সর্বনিম্ন ২১ ডিগ্রি।

সুন্দরবনের উদ্দিদ : সুন্দরবনের উদ্ভিদকুল বৈচিত্র্যময়। এখানকার অধিকাংশ গাছপালা ম্যানগ্রোভ ধরনের। এখানে রয়েছে বৃক্ষ, লতাগুল্ম, ঘাস, পরগাছা ইত্যাদি উদ্ভিদ। উদ্ভিদবিজ্ঞানী ডি.প্রেইন সুন্দরবনে ৩৩৪ প্রজাতির উদ্ভিদ আছে বলে উল্লেখ করেছেন। পৃথিবীতে এ পর্যন্ত সন্ধানপ্রাপ্ত ৫০টি ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদের মধ্যে সুন্দরবনেই আছে ৩৫টি। সুন্দরবনের উদ্ভিদের মধ্যে রয়েছে সুন্দরী, গরান, গেওয়া, কেওড়া, ওড়া পশুর, ধুন্দল, বাইন প্রভৃতি। এছাড়া সুন্দরবনের প্রায় সবখানেই জন্মে গোলপাতা।

সুন্দরবনের প্রাণী : বিচিত্র সব প্রাণীর বাস সুন্দরবনে। সুন্দরবনে রয়েছে প্রায় ৫০ প্রজাতির স্তন্যপায়ী, ৫০ প্রজাতির সরীসৃপ, ৩২০ প্রজাতির পাখি, ৮ প্রজাতির উভয়চর প্রাণী এবং ৪০০ প্রজাতির মাছ। সুন্দরবনের স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মধ্যে রয়েল বেঙ্গল টাইগার পৃথিবী বিখ্যাত। এছাড়া রয়েছে চিত্রা ও মায়া হরিণ, বানর, বনবিড়াল, লিওপার্ড, শজারু, উদ এবং বন্য শূকর। এখানে রয়েছে বিচিত্র সব পাখি। বক, সারস, হাড়গিলা, কাদাখোঁচা, লেনজা ও হাট্টিটি এখানকার নদী-নালা ও গাছপালার মাঝে বসবাস করে। সমুদ্র উপকূলে দেখা যায় গাংচিল, জল কবুতর, টার্ন ইত্যাদি। এছাড়া চিল, ঈগল, শকুন, মাছরাঙা, কাঠঠোকরা, ভগীরথ, পেঁচা, মধুপায়ী, বুলবুলি, শালিক, ফিঙ্গে, ঘুঘু, বেনে বৌ, হাঁড়িচাঁচা, ফুলঝরি, মুনিয়া, টুনটুনি, দোয়েল, বাবুই, প্রভৃতি পাখি সুন্দরবনে বাস করে। সুন্দরবনের সরীসৃপদের মধ্যে রয়েছে কুমির, সাপ, টিকটিকি জাতীয় সরীসৃপ ইত্যাদি।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সুন্দরবনের অবস্থান : সুন্দরবনে প্রাপ্ত কাঠ জ্বালানি ও কাঠকয়লা হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া ম্যানগ্রোভের ফল গো-খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। গোলপাতা শুকিয়ে ঘরের চাল ও বেড়া তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। সুন্দরবনে যে শামুক-ঝিনুক পাওয়া যায়, তা খাবার চুনের ভালো উৎস। সুন্দরবনের মধুর উপর নির্ভর করে একশ্রেণির মানুষ তাদের জীবিকা নির্বাহ করে। দেশে বিক্রির পাশাপাশি এ মধু বিদেশেও রপ্তানি হয়। মৎস্যজীবীরা সুন্দরবন থেকে মাছ ধরে তা স্থানীয় বাজারসহ বিভিন্ন স্থানে বিক্রি করে। সুন্দরবনের বনজ সম্পদকে কেন্দ্র করে কয়েকটি শিল্প–কারখানা গড়ে উঠেছে। এর মধ্যে খুলনা নিউজপ্রিন্ট ও হার্ডবোর্ড মিলস উল্লেখযোগ্য।

বর্তমানে সুন্দরবনের অবস্থা : সুন্দরবনের বনজ সম্পদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে মানুষ অহরহ প্রবেশ করছে এখানে। ফলে এর ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। এছাড়া লবণাক্ততা বৃদ্ধি পেয়ে ম্যানগ্রোভও ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। রয়েল বেঙ্গল টাইগারের শেষ আবাসস্থল সুন্দরবন। চোরা শিকারিদের হামলায় বাঘের সংখ্যা কমতে কমতে ৪৫০-এ এসে দাঁড়িয়েছে। সাম্প্রতিক আইলায় সুন্দরবন ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে।

উপসংহার : সুন্দরবন আমাদের ঐতিহ্য। দেশের দক্ষিণাঞ্চলের মানুষের আর্থ–সামাজিক অবস্থানকে উন্নত করতে সুন্দর বনের ভূমিকা অনস্বীকার্য। পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট সুন্দরবন। তাই আমাদের উচিত সুন্দরবন ও এর প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষায় নিজ নিজ অবস্থান থেকে উদ্যোগী হওয়া।

১০ আমাদের দেশ

সূচনা : 'সকল দেশের রানি সে যে আমার জন্মভূমি।'

সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলা আমাদের এই বাংলাদেশ। সবুজে ঘেরা, পাখি ডাকা দেশটির রূ পের কোনো শেষ নেই। কবির দেশ, বীরের দেশ, গানের দেশ, মায়ের দেশ– এরকম অনেক নামে এ দেশকে ডাকা হয়।

অবস্থান : বাংলাদেশ দৰিণ এশিয়ার একটি স্বাধীন দেশ। এর সীমান্তের অধিকাংশ জুড়ে আছে ভারত। আর সামান্য অংশে মিয়ানমার। দৰিণে রয়েছে বঙ্গোপসাগর।

স্বাধীনতা লাভ : ১৯৭১ সালে এক রক্তৰয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে।

জনসংখ্যা : জনসংখ্যার দিক থেকে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান অষ্টম। বর্তমানে দেশটির জনসংখ্যা প্রায় ১৬ কোটি।

ভাষা : বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। এদেশে অনেক জাতি–গোষ্ঠীর লোক বাস করে। এদের প্রত্যেকেরই রয়েছে নিজস্ব ভাষা। তবে বাংলা–ই আমাদের রাষ্ট্রভাষা।

ভূ–প্রকৃতি : বাংলাদেশের প্রায় সবটাই সমভূমি। সিলেট, চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও কুমিলৱার কিছু অংশে পাহাড় রয়েছে। এছাড়া রয়েছে শত–সহস্র আঁকাবাঁকা নদ–নদী।

ঋতুবৈচিত্র্য : বাংলাদেশ ষড়ঋতুর দেশ। প্রতি দুই মাসে একটি করে ঋতুর পালাবদল ঘটে। একেক ঋতুতে প্রকৃতি একেক সাজে সেজে ওঠে। প্রতিটি ঋতুর সৌন্দর্যই অতুলনীয়। এদেশের অপরূ প প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মূল কারণ এই ঋতুবৈচিত্র্য।

জনজীবনের বৈচিত্র্য : বাংলাদেশে আছে নানা ধর্মের, নানা পেশার লোকজন। বাঙালি ছাড়াও দেশে বিভিন্ন জাতি–গোষ্ঠীর মানুষ বসবাস করে। তাদের আছে নিজস্ব জীবনযাপন পদ্ধতি। সব ধরনের মানুষ এদেশে মিলেমিশে থাকে।

অর্থনৈতিক অবস্থা : বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। অর্থাৎ সমৃদ্ধ জাতি হিসেবে পরিচিত হওয়া থেকে এখনও আমরা অনেক পিছিয়ে। তবে আমাদের অর্থনীতি খুবই দ্রবত বিকাশ লাভ করেছে। এ দেশ মূলত কৃষিনির্ভর হলেও বিভিন্ন শিল্পখাত থেকে আমরা অনেক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছি।

প্রাকৃতিক সম্পদ : বাংলাদেশ প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ একটি দেশ। গ্যাস আমাদের প্রধান সম্পদ। এছাড়াও রয়েছে কয়লা, চুনাপাথর প্রভৃতি।

উপসংহার : বাংলাদেশ আমাদের গর্ব ও অহংকার। অনেক আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা এদেশকে স্বাধীন করেছি। দেশকে আমরা মায়ের মতো ভালোবাসি।

[অতিরিক্ত অংশ]

১১ বাংলাদেশের ষড়ঋতু

সূচনা : 'সকল দেশের রানি সে যে আমার জন্মভূমি।'

অপরূ প সৌন্দর্যে ভরা বাংলাদেশের প্রকৃতি। ঋতুতে ঋতুতে বাংলার প্রকৃতি সেজে ওঠে নানা বৈচিত্র্যময় রূ পে। আর তার গুণেই এদেশ সৌন্দর্যের দিক দিয়ে সকল দেশের রানি।

ঋতুর পরিচয় : বাংলাদেশ ষড়ঋতুর দেশ। প্রতি দুই মাসে একটি করে ঋতু বদল হয়। ঋতুগুলো হচ্ছে– গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত।

গ্রীষ্ম : গ্রীষ্ম আমাদের দেশের প্রথম ঋতু। বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ এ দুই মাস মিলে গ্রীষ্ম ঋতু। এ সময় প্রচণ্ড গরম পড়ে। রৌদ্রের তাপ তখন অসহ্য লাগে। নদী–নালা, খাল–বিলের জল শুকিয়ে খা খা করে। কখনো কখনো এ ঋতুতে কালবৈশাখী ঝড় হয়।

বর্ষা : আষাঢ় ও শ্রাবণ– এ দুই মাস মিলে বর্ষাকাল। তখন অবিরাম ধারায় বৃষ্টি পড়ে। কখনো হুড়মুড় করে মুষলধারে বৃষ্টি নামে। কখনো বা হয় ঝিরিঝিরি ইলশেগুঁড়ি। খাল–বিল, নদী-নালা পানিতে ভরে যায়।

শরৎ : বর্ষার পর আসে শরৎ। ভাদ্র ও আশ্বিন– এ দুই মাস মিলে শরৎ ঋতু। আকাশ তখন হয় ঘন নীল। তার গায়ে তুলোর মতো সাদা সাদা মেঘেরা ভেসে বেড়ায়। তখন চারপাশে শিউলি ও কাশফুলের অপূর্ব সমারোহ দেখা যায়।

হেমন্ত : শরতের পরই চুপি চুপি আসে লাজুক ঋতু হেমন্ত। সাথে করে আনে শীতের আগমনী বার্তা। ভোরবেলায় তখন শীত শীত লাগে। সোনালি পাকা ধানে গ্রামের মাঠগুলো ভরে ওঠে। কার্তিক ও অগ্রহায়ণ– এ দুই মাস মিলে হেমন্তকাল।

শীত : পৌষ ও মাঘ– এ দুই মাস মিলে শীতকাল। এ সময় হাড়কাঁপানো শীত অনুভূত হয়। রাতের বেলা লেপ কাঁথা গায়ে দিয়ে ঘুমাতে হয়। দিনের বেলাতেও গায়ে গরম কাপড় পরতে হয়। এ সময় ঘরে ঘরে পিঠা–পায়েস ও খেজুরের রস খাওয়ার ধুম পড়ে যায়।

বসন্ত : শীতের শেষে আসে বছরের শেষ ঋতু বসন্ত। ফাল্গুন ও চৈত্র মাস মিলে এ ঋতু। এ সময় ফুরফুরে দখিনা বাতাস বয়। মন প্রাণ খুশিতে নেচে ওঠে। সবুজ পত্রপলৱব আর নানা রঙের ফুলে প্রকৃতি সতেজ রূ প ধারণ করে।

উপসংহার : বাংলাদেশের ছয়টি ঋতুর সৌন্দর্যই অতুলনীয়। ঋতুর এ বৈচিত্র্যই আমাদের প্রকৃতিকে করেছে অসামান্য সুন্দর।

১২ আমাদের গ্রাম

সূচনা : 'আমাদের ছোট গ্রাম মায়ের সমান

আলো দিয়ে বায়ু দিয়ে বাঁচাইছে প্রাণ।'

আমাদের গ্রামের নাম ঘোপাল। গ্রামটি ফেনী জেলার ছাগলনাইয়া থানায় অবস্থিত। গ্রামের এক পাশ দিয়ে বয়ে গেছে ফেনী নদী।

সৌন্দর্য : আমাদের গ্রামটি ছবির মতো সুন্দর। আম, কাঁঠাল, বটসহ নানা রকম গাছ গাছালিতে গ্রামটি ঘেরা। চারদিকে সবুজ আর সবুজ। বিভিন্ন মৌসুমে ফোটে নানারকম ফুল। গ্রামের মেঠো পথ, সোনালি ধানৰেত, ছায়া ঢাকা বাঁশঝাড় দেখলে মন জুড়িয়ে যায়। প্রকৃতি যেন আপন খেয়ালে গ্রামটিকে সাজিয়েছে।

গ্রামের মানুষ : আমাদের গ্রামে প্রায় দেড় হাজার লোকের বাস। এখানে আছে নানা পেশার, নানা ধর্মের মানুষ। গ্রামের মানুষ মিলেমিশে বসবাস করে। কেউ ঝগড়া-বিবাদ করে না।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান : আমাদের গ্রামে দুটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে। গ্রামের ছেলেমেয়েরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে জীবনের প্রথম পাঠ শুরব করে। প্রাথমিক পাঠ শেষ করে ভর্তি হয় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে। আমাদের গ্রামে একটি সেচ্ছাসেবক নৈশ বিদ্যালয় আছে। যাঁরা লেখাপড়া জানেন না, গ্রামের শিৰিত যুবকেরা তাঁদের সন্ধ্যার পর লেখাপড়া শেখান। আমাদের গ্রামে কোনো নিরৰর লোক নেই।

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান : আমাদের গ্রামে যেমন শিৰা প্রতিষ্ঠান রয়েছে, তেমনি রয়েছে বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠানও। যেমন– পোস্ট অফিস, দাতব্য চিকিৎসালয়, কৃষি অফিস ইত্যাদি।

যোগাযোগ ব্যবস্থা : আমাদের গ্রামের পূর্ব পাশ দিয়ে নদী বয়ে চলেছে। গ্রামের তিন পাশে রাস্তা রয়েছে। দৰিণের রাস্তায় বড় গাড়ি চলে। সব রাস্তায় রিকশা-ভ্যান চললেও গ্রামের বেশিরভাগ মানুষ হেঁটে চলাচল করে।

আর্থিক অবস্থা : আমাদের গ্রামের মানুষের আর্থিক অবস্থা মোটামুটি ভালো। গ্রামের মাঠে মাঠে ফলে প্রচুর ধান, পাট, গম, মসুর, সরিষা, আখ ইত্যাদি। বড় বড় পুকুরগুলোতে নানা রকম মাছের চাষ হয়।

সামাজিক অবস্থা : অর্থনৈতিক দিক থেকে আমাদের গ্রাম সচ্ছল। গ্রামের সবাই স্বনির্ভর বলে চুরি-ডাকাতি খুন-খারাবির কোনো বালাই নেই। গ্রামের শতভাগ লোকের অৰরজ্ঞান থাকায় কোনো রকমের কুসংস্কার নেই।

উপসংহার : আমাদের গ্রামকে আমরা সবাই মায়ের মতো ভালোবাসি। গ্রামের উন্নয়নে সবাই মিলেমিশে কাজ করার চেষ্টা করি।

১৩ আমাদের বিদ্যালয়

সূচনা : "বিদ্যালয়, মোদের বিদ্যালয়,
এখানে সভ্যতারই ফুল ফোটানো হয়।"

বিদ্যালয় হচ্ছে ভালো মানুষ গড়ার কারখানা। আমি যে বিদ্যালয়ে পড়ালেখা করি তার নাম জয়পুর সরোজিনী উচ্চ বিদ্যালয়। এ বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণি হতে দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ানো হয়।

অবস্থান : আমাদের বিদ্যালয়টি ফেনী জেলার ছাগলনাইয়া থানার জয়পুর গ্রামে অবস্থিত। বিদ্যালয়ে আসার জন্য ভালো ব্যবস্থা রয়েছে। আশপাশের যে কোনো গ্রাম থেকে সহজেই আমাদের স্কুলে আসা যায়।

বিদ্যালয়ের পরিবেশ : বিদ্যালয়ে বিভিন্ন ধরনের গাছ রয়েছে। বিশাল প্রাঙ্গণে দুটি রয়েছে চারতলা ভবন। প্রধান শিৰকের নিজস্ব মনোরম কৰ রয়েছে। বিভিন্ন অংশে বিভক্ত একটি বড় অফিস রবম আছে। বিশ জন শিৰকের জন্য রয়েছে একটি সুন্দর কৰ। সেখানে বিভিন্ন ধরনের বই রয়েছে। বিদ্যালয় ভবনের সামনে আছে বিশাল মাঠ।

ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকমণ্ডলী : আমাদের বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ৮০০। শিৰকগণ আমাদেরকে অত্যন্ত আন্তরিকভাবে পড়ান। আমরাও তাঁদের গভীরভাবে শ্রদ্ধা করি।

লাইব্রেরি : আমাদের বিদ্যালয়ের লাইব্রেরিটি বেশ সমৃদ্ধ। এখানে নানা ধরনের বই রাখা আছে। লাইব্রেরি থেকে বই ধার করে বাড়িতে নিয়েও পড়া যায়।

খেলাধুলা : আমাদের বিদ্যালয়ের সামনে আছে বড় একটি খেলার মাঠ। এখানে আমরা নানা রকম খেলাধুলা করি। বিদ্যালয়ে একজন ক্রীড়া শিৰক আছেন। তিনি নিয়মিত খেলাধুলা ও শরীরচর্চা পরিচালনা করে থাকেন।

সৃজনশীল কর্মকান্ড : আমাদের বিদ্যালয়ে অনেকগুলো ক্লাব আছে। যেমন– বিতর্ক ক্লাব, বিজ্ঞান ক্লাব, আবৃত্তিচর্চা ক্লাব, শরীরচর্চা ক্লাব ইত্যাদি। এগুলোর মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন সৃজনশীল কর্মকান্ডে অংশ নিয়ে থাকি।

অনুষ্ঠান : আমাদের বিদ্যালয়ে নানা ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য আমাদের বিদ্যালয়টির বেশ সুনাম রয়েছে। প্রতি বছর ফেব্রবয়ারি মাসে আমাদের বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। এছাড়াও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবসসহ বিভিন্ন দিবসে নানা রকম আয়োজন থাকে।

ফলাফল : প্রাথমিক শিৰা সমাপনী পরীৰায় প্রতি বছর আমাদের বিদ্যালয় থেকে ট্যালেন্টপুলে বৃত্তিসহ বেশ কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রী A^+ পায়। জেএসসি ও এসএসসি পরীৰায় ফলাফলও সবার নজর কাড়ে।

উপসংহার : আমাদের বিদ্যালয়টি একটি আদর্শ প্রাথমিক বিদ্যালয়। এরূ প একটি বিদ্যালয়ে পড়ালেখা করতে পেরে আমি সত্যিই গর্বিত।

১৪ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ

ভূমিকা : মুক্তিযুদ্ধ বাঙালির জাতীয় জীবনের উজ্জ্বলতম অধ্যায়। মহান এই সংগ্রামের মাধ্যমে বাঙালি প্রমাণ করেছে যে তারা কোনো অন্যায়ের সামনেই মাথা নত করে না। আর এর ফলাফল হিসেবে আমরা পেয়েছি স্বাধীন স্বদেশ ভূমি।

পটভূমি : ১৯৪৭ সালে ইংরেজরা এই উপমহাদেশ ছেড়ে চলে গেলে ভারত ও পাকিস্তান নামক দুটি রাষ্ট্রের জন্ম হয়। পাকিস্তানের দুটি অংশ ছিল– পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তান। পশ্চিম পাকিস্তানিরা পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসী অর্থাৎ বাঙালিদের উপর নানাভাবে শোষণ ও নির্যাতন চালাত। সব ক্ষেত্রে বাঙালিদের বঞ্চিত করত। নিরীহ বাঙালি ধীরে ধীরে নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে এবং স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম শুরু করে। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ জয়লাভ করলেও পাকিস্তানি সামরিক সরকার শাসনভার হস্তান্তর করল না। ১৯৭১ সালে ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু এক ঐতিহাসিক ভাষণে বাঙালি জাতিকে স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে নির্দেশ দেন।

মুক্তিযুদ্ধের বিবরণ : ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতে নিরস্ত্র বাঙালির উপর পাকিস্তানিরা বর্বর আক্রমণ চালায়। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর হাতে গ্রেফতার হওয়ার আগে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা ন। ১৭ই এপ্রিল স্বাধীন বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার শপথ গ্রহণ করে। ১১টি সেক্টরে দেশকে ভাগ করে কৃষক-শ্রমিক, ছাত্র-পুলিশ আনসার সবাই মিলে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ৪ঠা ডিসেম্বর ভারতীয় মিত্রবাহিনী আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে মিলিত হয়ে পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে। তাদের সম্মিলিত আক্রমণে হানাদাররা দিশেহারা হয়ে পড়ে। পরাজয় বুঝতে পেয়ে তারা দেশদ্রোহী রাজাকার, আলবদর, আল শামসদের সহায়তায় এদেশের অসংখ্য বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করে। অবশেষে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর রেসকোর্স ময়দানে পাকিস্তানিরা আত্মসমর্পণ করে।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা : মুক্তিযুদ্ধের ফলে আমরা পেয়েছি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের স্বীকৃতি। পেয়েছি আমাদের ন্যায্য অধিকার। তবে এতসব অর্জনের মাঝে হারানোর বেদনাও আমাদের রয়েছে। স্বাধীনতার জন্য জীবন দিয়েছেন ত্রিশ লক্ষ দেশপ্রেমিক জনতা। নির্যাতনের শিকার হয়েছে অসংখ্য মা-বোন। তাই মুক্তিযুদ্ধ আমাদের একই সাথে গর্বের ও বেদনার স্মৃতি মনে করিয়ে দেয়।

উপসংহার : মুক্তিযুদ্ধ বাঙালির ইতিহাসের এক সোনালি অধ্যায়। এর চেতনাকে নিজেদের মাঝে ধারণ করার মাধ্যমে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। তবেই আমরা সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে পারব।

১৫ স্বাধীনতা দিবস

সূচনা : স্বাধীনতা মানে মুক্তি, বন্ধনহীনতা। দীর্ঘ সময় ধরে আমরা ছিলাম পরাধীন একটি জাতি। ১৯৭১ সালে ২৬শে মার্চ তারিখে সেই শৃঙ্খল থেকে চিরতরে মুক্তির লড়াই শুরু হয়। শত্রুর হাত থেকে স্বদেশ ভূমি তখনও মুক্ত না হলেও মনে মনে আমরা নিজেদের সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবতে শুরু করি এদিন থেকেই। তাই ২৬শে মার্চ আমাদের স্বাধীনতা দিবস।

ঐতিহাসিক পটভূমি : স্বাধীনতা দিবসের গৌরব লাভের পেছনে রয়েছে বাঙালি জাতির দীর্ঘদিনের সংগ্রামের ইতিহাস। ১৯৪৭ সালের দেশবিভাগের পর হতে ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত বর্তমান বাংলাদেশ ছিল পাকিস্তানের অধীন। তখন এর নাম ছিল পূর্ব পাকিস্তান। এ দীর্ঘ সময় ধরে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক– সকল দিক দিয়েই পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী আমাদেরকে শোষণ করে আসছিল। এর প্রতিবাদে বাঙালিরা রুখে দাঁড়ায়। ১৯৪৭–৭১ পর্যন্ত পুরোটা সময়ই বাঙালি তার অধিকার আদায়ের সংগ্রামে লিপ্ত থেকেছে, ঝরেছে অনেক রক্ত।

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার সংগ্রামের ডাক দেন। এরপর আসে ২৫শে মার্চ কালো রাত। পাকিস্তানি হানাদাররা এ রাতে ঢাকা শহরে নির্মম হত্যাযজ্ঞ চালায়। ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে পাকিস্তানিদের হাতে গ্রেফতার হওয়ার আগে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন এবং দেশকে শত্রুমুক্ত করার নির্দেশ দেন। তাঁর ডাকে সাড়া দিয়েই সর্বস্তরের বাঙালি ঝাঁপিয়ে পড়ে যুদ্ধে। অনেক রক্তক্ষয়ের পর অবশেষে ১৬ই ডিসেম্বর আমরা চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করি ।

স্বাধীনতা দিবসের চেতনা : আমরা সবাই স্বাধীন একটি দেশের নাগরিক। স্বাধীনতা দিবসে এ বিষয়টি আমরা আরও ভালোভাবে অনুধাবন করতে পারি। এ দেশের জন্য শহিদদের অবদানের মূল্য বুঝতে পারি। দেশের প্রতি আমাদের ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়। নিজেদের অধিকারের বিষয়ে সচেতন হই।

উদ্‌যাপন : প্রতি বছর নানা আয়োজনে দেশের মানুষ এই দিনটি উদযাপন করে। সরকারি, বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলো সভা, সেমিনার ইত্যাদির আয়োজন করে। স্কুলগুলোতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। সর্বস্তরের মানুষ জাতীয় স্মৃতিসৌধে ফুল দিয়ে মহান মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানায়।

উপসংহার : মুক্তির যে বার্তা আমরা ২৬শে মার্চ তারিখে পেয়েছিলাম তা পরিপূর্ণভাবে অর্জিত হয়েছে অনেক তাজা প্রাণ আর রক্তের বিনিময়ে। তাই এই অর্জনকে আমরা বৃথা যেতে দেব না। দেশকে ভালোবাসব, দেশের স্বাধীনতা রক্ষায় সদা সচেষ্ট থাকব।

১৬ বিজয় দিবস

সূচনা : কাল যেখানে পরাজয়ের কালো সন্ধ্যা হয়,
আজ সেখানে নতুন করে রৌদ্র লেখে জয়।

বাঙালির জাতীয় জীবনে ১৬ই ডিসেম্বর এক মহিমান্বিত দিন। এ দিনটি আমাদের বিজয় দিবস। দীর্ঘ নয় মাস সংগ্রাম শেষে এই দিনেই আমরা চূড়ান্তভাবে স্বাধীনতা লাভে সৰম হই।

পটভূমি : ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশদের দীর্ঘ ২০০ বছরের শাসনের অবসান ঘটলে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি রাষ্ট্র গঠিত হয়। পাকিস্তান আবার দুটি অংশে বিভক্ত ছিল। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান। বাংলাদেশ অর্থাৎ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ নতুন করে পরাধীন হয় পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর হাতে। তাদের অত্যাচারে আমাদের মৌলিক অধিকারসমূহ ভুলুণ্ঠিত হয়। আমাদের শিৰা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্যের ওপরও তারা আঘাত হানে। এমনকি আমাদের মুখের ভাষা পর্যন্ত কেড়ে নিতে চায়। বাংলার সংগ্রামী জনতা তাদের সমস্ত অত্যাচারের বিরবদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলে। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বাঙালির প্রাণপ্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ নির্বাচনে জয় লাভ করে। কিন্তু পাকিস্তান সরকার রাষ্ট্রীয় ৰমতা ছাড়তে চায় না। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ এক ঐতিহাসিক ভাষণে বঙ্গবন্ধু সমগ্র দেশবাসীকে সশস্ত্র সংগ্রামের প্রস্তুতি নেওয়ার আহ্বান জানান। সেই রাতেই পাকিস্তানি হানাদাররা নিরীহ বাঙালির ওপর হামলা চালায়। অসংখ্য মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করে। তাদের সেই ধ্বংসযজ্ঞ চলে পরবর্তী নয় মাস ধরেই। সর্বস্তরের বাঙালি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। মুক্তিযোদ্ধাগণ দেশের ভেতরে ধীরে ধীরে সংগঠিত হতে থাকেন। তাঁরা পাক-হানাদারদের বিরবদ্ধে প্রাণ বাজি রেখে যুদ্ধ করেন।

বিজয় দিবসের তাৎপর্য : দীর্ঘ নয় মাস মুক্তিসংগ্রাম চলে। মুক্তিযোদ্ধাদের গেরিলা আক্রমণের মুখে পাকবাহিনী দিন দিন দুর্বল হয়ে পড়ে। অবশেষে ১৬ই ডিসেম্বর হানাদাররা আমাদের বীর মুক্তিযোদ্ধাদের নিকট আত্মসমর্পণ করে। ২৬শে মার্চ মুক্তিযুদ্ধ শুরব হলেও সেই দিনই আমাদের স্বাধীনতা অর্জিত হয় নি। আমরা জয়লাভ করেছি ১৬ই ডিসেম্বরে। তাই ১৬ই ডিসেম্বর আমাদের বিজয় দিবস।

বিজয় দিবসের চেতনা : বিজয় দিবস আমাদের দেশপ্রেমকে শাণিত করে। আমরা অন্যায়ের বিরবদ্ধে মাথা উঁচু করে লড়াই করার প্রেরণা পাই। দেশের সার্বভৌমত্ব রৰায় নিজেদের কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হই।

উপসংহার : লাখো মানুষের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে মহান স্বাধীনতা। ১৬ই ডিসেম্বর আমাদের সেই গৌরবের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

১৭ একুশে ফেব্রুয়ারি

সূচনা : "আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রবয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি?"

২১শে ফেব্রবয়ারি আমাদের জাতীয় জীবনে একটি স্মরণীয় দিন। ১৯৫২ সালের এ দিনটিতে মাতৃভাষা বাংলার মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে আন্দোলন করেছিল হাজার হাজার বাঙালি। ভাষার জন্য জীবন দিয়েছিলেন সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার, শফিকসহ নাম না জানা অনেকে। তাই এই দিনটি আমাদের জন্য একই সাথে গৌরবের ও বেদনার।

একুশে ফেব্রুয়ারির প্রেক্ষাপট : ১৯৫২ সালের ২৬শে জানুয়ারি পাকিস্তানের নতুন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন ঢাকায় এক জনসভায় একমাত্র উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা দেন। এর প্রতিবাদে বাংলার ছাত্র–জনতা আন্দোলনের ডাক দেয়। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রবয়ারি এ আন্দোলন চূড়ান্ত রূ প লাভ করে। দিনটিতে সর্বস্তরের বাঙালি সরকারি নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গ করে মিছিল বের করে। পুলিশ নিরস্ত্র ছাত্র-জনতার উপর গুলি চালালে নিহত হয় অনেকে। হত্যাকাণ্ডের খবর ছড়িয়ে পড়লে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে গোটা দেশের ছাত্র-জনতা। আন্দোলন আরও তীব্র হয়। এর ফলে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাংলাকে পূর্ববাংলার রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়।

শহিদ মিনার : প্রতি বছর ২১শে ফেব্রবয়ারি আমরা কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে ফুল দিয়ে ভাষাশহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই। ২১শে ফেব্রবয়ারি শহিদ হওয়া আবুল বরকত যে স্থানে শহিদ হয়েছিলেন সেখানে ২৩শে ফেব্রবয়ারি একটি শহিদ মিনার নির্মিত হয়। ঢাকা মেডিকেল কলেজের শিৰার্থীরা রাতারাতি ইট দিয়ে স্মৃতিফলকটি গড়ে তোলেন। ২৬ তারিখ পুলিশ সেটি ভেঙে দেয়। অবশেষে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার পরে ১৯৫৭ সালে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারের কাজ শরব হয়। ১৯৬৩ সালে শহিদ আবুল বরকতের মা এটি উদ্বোধন করেন।

একুশের চেতনা : বায়ান্নর একুশে ফেব্রবয়ারিতে বাঙালি লড়াই করে তার অধিকার আদায় করেছে। তাই এ দিনটি আমাদের মাঝে অধিকার চেতনা নিয়ে আসে। বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনের সূচনাও ঘটে ভাষা আন্দোলন থেকেই। তাই এ দিনে আমরা সুন্দর দেশ গড়ার প্রেরণা পাই। অন্যায়ের বিরবদ্ধে প্রতিবাদী হওয়ার সাহস পাই।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস : একুশে ফেব্রবয়ারি আজ পালিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে। এ দিনটি পৃথিবীর সব ভাষার মানুষ মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালন করে। এটি আমাদের জন্য অত্যন্ত গৌরবের।

একুশে ফেব্রুয়ারি পালন : প্রতি বছর নানা আয়োজনে এ দিনটি সরকারি ও বেসরকারিভাবে পালন করা হয়। সারা দেশের শহিদ মিনারগুলোতে ভোরবেলা শহিদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জানানো

হয়। স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা এদিন খালি পায়ে হেঁটে শহিদ মিনারে গিয়ে ফুল দেয়।

উপসংহার : একুশ আমাদের অহংকার। এ দিনটি মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার প্রতি আমাদের ভালোবাসা বাড়িয়ে দেয়। একুশের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আমরা দেশের জন্য কাজ করব।

১৮ সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি

অথবা, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

সূচনা : "যতদিন রবে পদ্মা, মেঘনা, গৌরী, যমুনা বহমান,
ততদিন রবে কীর্তি তোমার শেখ মুজিবুর রহমান।"

আপন কীর্তিতে বাংলার ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালির আসনটি চিরকালের জন্য অধিকার করে নিয়েছেন শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি। আমাদের জাতির জনক।

জন্ম ও শৈশব : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ বর্তমান গোপালগঞ্জ (তৎকালীন ফরিদপুর) জেলার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। আদর করে বাবা তাঁর নাম রাখেন খোকা। শৈশবকাল থেকেই গরিব মানুষদের প্রতি তাঁর ছিল অসামান্য টান। মানুষের দুঃখে-কষ্টে তাদের নানাভাবে সাহায্য করতেন তিনি।

ছাত্রজীবন : সাত বছর বয়সে বঙ্গবন্ধু ভর্তি হন গিমাডাঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। গোপালগঞ্জ মিশনারি স্কুল থেকে ১৯৪২ সালে ম্যাট্রিক পাস করেন। ১৯৪২ সালে শেখ মুজিব কলকাতায় ইসলামিয়া কলেজে ভর্তি হন। ১৯৪৭ সালে ভর্তি হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় অন্যায়-অবিচারের বিরবদ্ধে প্রতিবাদে শেখ মুজিব সবসময় থাকতেন সামনের কাতারে।

রাজনৈতিক জীবন : ছাত্রজীবন থেকেই বঙ্গবন্ধু রাজনীতিতে যুক্ত হন। ভাষা আন্দোলনসহ বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনে যোগ দিয়ে তাঁকে বহুবার গ্রেপ্তার ও কারাবরণ করতে হয়। কলকাতায় ইসলামিয়া কলেজে থাকাকালীন তৎকালীন মুসলিম লীগে যোগ দেন। আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হলে শেখ মুজিবকে করা হয় দলের যুগ্ম সম্পাদক। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সময় তিনি জেলে বন্দি অবস্থায় অনশন পালন করেন। ১৯৫৪ সালে পূর্ব পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয় ঘটলে শেখ মুজিব মন্ত্রী হন। ১৯৬৬ সালে তিনি বাঙালির মুক্তির সনদ ৬ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেন। ১৯৬৮ সালে জেলে থাকা অবস্থায় তাঁর বিরবদ্ধে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা করা হয়। ১৯৬৯ সালে প্রবল আন্দোলনের মুখে আইয়ুব খান শেখ মুজিবকে মুক্তি দিতে বাধ্য হন। ২৩শে ফেব্রুয়ারি ঢাকা রেসকোর্স ময়দানে ছাত্র-জনতার বিশাল জনসভায় তাঁকে 'বঙ্গবন্ধু' অ্যাখ্যা দেওয়া হয়। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে তাঁর নেতৃত্বেই আওয়ামী লীগ বিশাল বিজয় অর্জন করে।

৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ : ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ তৎকালীন ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) প্রায় দশ লাখ লোকের উপস্থিতিতে বঙ্গবন্ধু এক ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। ঐ ভাষণে জাতিকে তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রস্তুতি গ্রহণের আহ্বান জানান। তিনি দৃঢ়চিত্তে বলেন :

"এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম।
এবারের সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম।"

স্বাধীনতার ঘোষণা : ১৯৭১ সালে ২৫শে মার্চ রাতে পাক হানাদার বাহিনী এদেশের মানুষের উপর অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাদের হাতে গ্রেফতার হওয়ার আগে ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে যান। সেই ডাকে সাড়া দিয়েই বাংলার মানুষ লড়াই করে দেশকে শত্রুমুক্ত করে।

স্বদেশ প্রত্যাবর্তন : ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি পাকিস্তানি কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে বঙ্গবন্ধু তাঁর প্রিয় দেশবাসীর কাছে ফিরে আসেন। এ পর্যায়ে তাঁর নেতৃত্বে শুরব হয় স্বাধীন বাংলাদেশ পুনর্গঠনের সংগ্রাম।

মৃত্যু : মাত্র সাড়ে তিন বছরের মধ্যে যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট সামরিক বাহিনীর কিছু বিপথগামী সদস্যের হাতে বঙ্গবন্ধু সপরিবারে শহিদ হন।

উসংহার : বাঙালি জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এদেশের মানুষের মুক্তির জন্য আমৃত্যু সংগ্রাম করেছেন তিনি। শুধু বাংলাদেশের জন্য নয়, বিশ্বের সকল মানুষের জন্যই তাঁর আদর্শ চিরস্মরণীয়।

১৯ অধ্যবসায়

সূচনা : ব্যর্থতা কেউ চায় না। সবাই সাফল্য খোঁজে। কিন্তু কেউই সব কাজে একবারে সফল হয় না। সফলতার জন্য বারবার চেষ্টা করতে হয়। কোনো কাজে সাফল্য লাভের জন্য বারবার এই চেষ্টার নামই অধ্যবসায়। অধ্যবসায় ছাড়া জীবনে উন্নতি লাভ করা যায় না। অধ্যবসায়ই হচ্ছে মানবসভ্যতার অগ্রগতির চাবিকাঠি।

অধ্যবসায় কী : অধ্যবসায় শব্দের আভিধানিক অর্থ অবিরাম সাধনা, ক্রমাগত চেষ্টা। কোনো নির্দিষ্ট লব্যে পৌঁছানোর জন্য অবিরাম সাধনা বা ক্রমাগত চেষ্টা চালিয়ে যাওয়াকে বলে অধ্যবসায়। ব্যর্থতায় নিরাশ না হয়ে কঠোর পরিশ্রম আর ধৈর্যের সাথে অভীষ্ঠ লব্যে পৌঁছানোর মধ্যেই অধ্যবসায়ের সার্থকতা নিহিত।

অধ্যবসায়ের পয়োজনীয়তা : ব্যর্থতাই সফলতার প্রথম সোপান। ব্যর্থতা থেকে সাধনার শুরু, আর সফলতার মাধ্যমে তার শেষ। তাই মানবজীবনে সাধনা বা অধ্যবসায়ের বিকল্প নেই। অধ্যবসায়ী মানুষ অসাধ্য সাধন করতে পারে। এমনকি অধ্যবসায়ের গুণেই মানুষ পৃথিবীতে অমরত্ব লাভ করতে পারে। তাই মানবজীবনে অধ্যবসায়ের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

ছাত্রজীবনে অধ্যবসায় : ছাত্রজীবনে অধ্যবসায়ের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। ছাত্রজীবনই ভবিষ্যৎ গড়ার উপযুক্ত সময়। এ সময় ব্যর্থ হলে সম্পূর্ণ মানবজীবনই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। যে ছাত্র অধ্যবসায়ী, সাফল্য তার হাতের মুঠোয়। অলস ছাত্র–ছাত্রী মেধাবী হলেও পড়াশোনায় কখনো সফল হতে পারে না। কঠোর অধ্যবসায় ছাড়া কোনো কাজেই জয়ী হওয়া যায় না। ছাত্রজীবনেই এই সত্য উপলব্ধি করে নিজেকে অধ্যবসায়ী হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। মনে রাখতে হবে কবি কালীপ্রসন্ন ঘোষের বিখ্যাত উক্তি :

পারিব না একথাটি বলিও না আর,
কেন পারিবে না তাহা ভাব একবার,
একবার না পারিলে দেখ শতবার।

অধ্যবসায় ও প্রতিভা : অধ্যবসায় প্রতিভার চেয়ে অনেক বড়। মনীষী ভল্‌তেয়ারের ভাষায়, 'প্রতিভা বলে কোনো কিছু নেই। পরিশ্রম ও সাধনা করে যাও তাহলে প্রতিভাকে অগ্রাহ্য করতে পারবে।' ডালটন বলেছেন, 'লোকে আমাকে প্রতিভাবান বলে; কিন্তু আমি পরিশ্রম ছাড়া আর কিছু জানি না।' বিজ্ঞানী নিউটনের উক্তি, 'আমার আবিষ্কার প্রতিভা–প্রসূত নয়, বহু বছরের অধ্যবসায় ও নিরবচ্ছিন্ন সাধনার ফল।' এ থেকেই বোঝা যায়, অধ্যবসায় ও পরিশ্রম ছাড়া শুধু প্রতিভার কোনো মূল্য নেই। প্রতিভাবান ব্যক্তিরা অধ্যবসায় দ্বারাই নিজের কাজকে সুসম্পন্ন করে তোলেন। আবার অধ্যবসায়ের দ্বারা অনেকে প্রতিভাবান হিসেবে সুনাম অর্জন করেন।

অধ্যবসায়ের উদাহরণ : পৃথিবীতে যেসব মনীষী সাফল্যের উচ্চ শিখরে অরোহণ করে অমরত্ব লাভ করেছেন, তাঁরা সকলেই ছিলেন অধ্যবসায়ী। স্কটল্যান্ডের রাজা রবার্ট ব্রুস ও ফ্রান্সের বিখ্যাত ঐতিহাসিক কার্লাইল অধ্যবসায়ের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। রবার্ট ব্রুস বারবার ইংরেজদের কাছে পরাজিত হয়েও যুদ্ধ–জয়ের আশা ও চেষ্টা ত্যাগ করেননি। ষষ্ঠবার পরাজিত হয়ে তিনি যুদ্ধ চিন্তায় মগ্ন আছেন, এমন সময় দেখতে পেলেন একটি মাকড়সা বারবার কড়িকাঠে সুতা বাঁধবার চেষ্টা করছে এবং ব্যর্থ হচ্ছে। এইভাবে ছয়বার ব্যর্থ হয়ে সপ্তমবারে মাকড়সাটি সফল হলো। এই দেখে রবার্ট ব্রুসও সপ্তমবার যুদ্ধ করে ইংরেজদের পরাজিত করেন এবং স্কটল্যান্ডের ওপর নিজের আধিপত্য বিস্তার করেন। মনীষী কার্লাইল তাঁর লেখা ফরাসি বিপরবের ইতিহাসের পাণ্ডুলিপি এক বন্ধুকে পড়তে দিয়েছিলেন। বন্ধুর বাড়ির কাজের মহিলা সেটিকে বাজে কাগজ ভেবে পুড়িয়ে ফেলেন। কার্লাইল এতে একটুও দমে যাননি। তিনি আবার চেষ্টা করে বইখানা লিখে বিশ্ববাসীকে উপহার দিয়েছিলেন। সম্রাট নেপোলিয়ান, আব্রাহাম লিঙ্কন, ক্রিস্টোফার কলম্বাস প্রমুখ মনীষীর জীবনও অধ্যবসায়ের এক বিরাট সাক্ষ্য। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় অধ্যবসায়ের গুণেই আজ বিশ্ববিখ্যাত। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কাজী নজরুল ইসলাম, সুকান্ত ভট্টাচার্য অধ্যবসায়ের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আমরা বাঙালিমাত্রই তাঁদের জন্য গর্বিত।

উপসংহার : অধ্যবসায় হচ্ছে জীবনসংগ্রামের মূল প্রেরণা। এ সংগ্রামে সফলতা ও ব্যর্থতা উভয়ই সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। তবে অধ্যবসায়ী মানুষ জীবনের সব ব্যর্থতাকে সাফল্যে পরিণত করতে পারে। তাই নির্দ্বিধায় বলা যায়, জীবনে সাফল্যের জন্য অধ্যবসায়ের বিকল্প নেই।

২০ স্বদেশপ্রেম

সূচনা : মানুষ স্বাভাবিকভাবেই তার জন্মস্থানকে ভালোবাসে। জন্মস্থানের আলো-জল-হাওয়া, পশু-পাখিসবুজ প্রকৃতির সাথে তার নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠে। জন্মস্থানের প্রতিটি ধূলিকণা তার কাছে মনে হয় সোনার চেয়েও দামি। সে উপলব্ধি করে–

মিছা মণি মুক্তা-হেম স্বদেশের প্রিয় প্রেম
তার চেয়ে রত্ন নাই আর।

মানুষের এই উপলব্ধিই হচ্ছে স্বদেশপ্রেম।

স্বদেশপ্রেমের সংজ্ঞার্থ : স্বদেশপ্রেম অর্থ হচ্ছে নিজের দেশের প্রতি, জাতির প্রতি, ভাষার প্রতি গভীর আকর্ষণ অনুভব করা। দেশের প্রতি প্রবল অনুরাগ, নিবিড় ভালোবাসা এবং যথার্থ আনুগত্যকে দেশপ্রেম বলে। জন্মভূমির স্বার্থে সর্বস্ব ত্যাগের সাধনাই স্বদেশপ্রেম ।

স্বদেশপ্রেমের স্বরূপ : স্বদেশ অর্থ নিজের দেশ। নিজের দেশকে সবাই ভালোবাসে। মাকে যেমন সবাই নিঃস্বার্থভাবে ভালোবাসে, তেমনি স্বদেশের প্রতিও সবার ভালোবাসা সকল স্বার্থের ঊর্ধ্বে। প্রত্যেক মানুষেরই কথায়, চিন্তায় ও কাজে প্রকাশ পায় স্বদেশের প্রতি নিবিড় মমত্ববোধ। এই বোধ বা চেতনা হৃদয়ের গভীর থেকে উৎসারিত। তাই এডউইন আর্নল্ড বলেছিলেন, 'জীবনকে ভালোবাসি সত্যি, কিন্তু দেশের চেয়ে বেশি নয়।' সংস্কৃত শেরাকে আছে : "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।" অর্থাৎ জননী ও জন্মভূমি স্বর্গের চেয়েও শ্রেষ্ঠ।

স্বদেশপ্রেমের অনুভূতি : দেশ ও দেশের মানুষের প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণ থেকে জন্ম হয় স্বদেশপ্রেমের। পৃথিবীর সব জায়গার আকাশ, চাঁদ, সূর্য এক হলেও স্বদেশপ্রেমের চেতনা থেকে মানুষ নিজের দেশের চাঁদ-সূর্য-আকাশকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করে ভালোবাসে। স্বদেশপ্রেমের অনুভূতি সবচেয়ে বেশি প্রকাশিত হয় দেশের স্বাধীনতা বিপন্ন হলে। তখন স্বদেশপ্রেমের প্রবল

আবেগে মানুষ নিজের জীবন দিতেও দ্বিধা করে না। কেননা সে জানে, দেশের জন্য 'নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান, ৰয় নাই তার ৰয় নাই।"

ছাত্রজীবনে স্বদেশপ্রেম : ছাত্ররাই দেশের ও জাতির ভবিষ্যৎ কর্ণধার। দেশের উন্নতি ও জাতির আশা পূরণের আশ্রয়স্থল। তাই দেশ ও জাতির প্রতি গভীর মমত্ববোধ ছাত্রজীবনেই জাগিয়ে তুলতে হবে। দেশকে ভালোবাসার উজ্জীবন মন্ত্রে দীৰিত হতে হবে। ছাত্রদের দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করতে পারলেই দেশের স্বার্থে প্রয়োজনে জীবন উৎসর্গ করার আগ্রহ সৃষ্টি হবে। তাদের কণ্ঠে উচ্চারিত হবে বিদ্রোহী কবির বাণী :

আমরা রচি ভালোবাসার আশার ভবিষ্যৎ,
মোদের স্বর্গ–পথের আভাস দেখায় আকাশ-ছায়াপথ।
মোদের চোখে বিশ্ববাসীর স্বপ্ন দেখা হোক সফল।
আমরা ছাত্রদল॥

বাঙালির স্বদেশপ্রেম : পৃথিবীতে যুগে যুগে অসংখ্য দেশপ্রেমিক জন্মেছেন। তাঁরা দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করে অমর হয়ে আছেন। বাংলাদেশেও তার অজস্র দৃষ্টান্ত রয়েছ। প্রাচীনকাল থেকে এ দেশে বিদেশি শক্তি প্রভুত্ব বিস্তারের চেষ্টা করেছে, আর স্বদেশপ্রেমিক বাঙালি দেশের স্বাধীনতা ও সম্মান রৰার্থে অকাতরে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে। ১৯৫২ সালে পাকিস্তানি স্বৈর-শাসকের হাতে বাংলা-ভাষার জন্য রফিক, শফিক, সালাম, জব্বার, বরকতের আত্মদান দেশপ্রেমের ৰেত্রে এক নতুন মাত্রা সংযোজন করেছে। ১৯৭১-এ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে আত্মদান করেছে অসংখ্য ছাত্র-শিৰক, কৃষক-শ্রমিক, সাংবাদিকবুদ্ধিজীবী, মা–বোনসহ সাধারণ মানুষ। অকুতোভয় শত-সহস্র এ সৈনিকের দেশপ্রেমের দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। এখনো এদেশের লৰকোটি জনতা দেশের সামান্য ৰতির সম্ভাবনায় বজ্রকণ্ঠে গর্জে ওঠে।

স্বদেশপ্রেম ও বিশ্বপ্রেম : স্বদেশপ্রেম মূলত বিশ্বপ্রেমেরই একটি অংশ। কেননা বিশ্বের সব মানুষই পৃথিবী নামক এই ভূখণ্ডের অধিবাসী। তাই স্বদেশপ্রেমের মাধ্যমে সকলেরই বিশ্বভ্রাতৃত্ব, মৈত্রী ও বিশ্ব-মানবতাকে উচ্চকিত করে তুলতে হবে। কারণ বিশ্বজননীর আঁচল-ছায়ায় দেশজননীর ঠাঁই। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সেজন্যই গেয়েছেন–

ও আমার দেশের মাটি, তোমার 'পরে ঠেকাই মাথা,
তোমাতে বিশ্বময়ীর – তোমাতে বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা॥

উপসংহার : দেশপ্রেম একটি নিঃস্বার্থ ও নির্লোভ আত্মানুভূতি। কোনো প্রকার লোভ বা লোভের বশবর্তী হয়ে দেশকে ভালোবাসা যায় না। প্রকৃত দেশপ্রেমিকের কাছে দেশের মঙ্গলই একমাত্র কাম্য। দেশের জন্য তাঁরা সর্বস্ব দান করতে পারেন। তাঁদের শৌর্য-বীর্য ও চারিত্রিক দৃঢ়তা আবহমানকাল ধরে জাতিকে প্রেরণা যোগায়। কাজেই ব্যক্তিস্বার্থ নয়, দেশ ও জাতির স্বার্থকে সবার উপরে স্থান দিতে হবে। দেশ গড়ার কাজে, দেশের জন্য মঙ্গলজনক কাজে আমাদের সকলকে নিবেদিতপ্রাণ হতে হবে। সর্বোপরি দেশকে ভালোবাসার মধ্য দিয়ে সমগ্র বিশ্বকে ভালোবাসতে শিখতে হবে। তবেই অর্জিত হবে স্বদেশপ্রেমের চূড়ান্ত সার্থকতা।

২১ পাহাড়পুর

অথবা, একটি ঐতিহাসিক স্থান

অথবা, একটি দর্শনীয় স্থান

সূচনা : গুরবত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগত কারণে ইতিহাসে মর্যাদা পাওয়া যে কয়টি স্থান বাংলাদেশে রয়েছে তার মধ্যে পাহাড়পুর অন্যতম। এটি বাংলাদেশের এমনকি দুনিয়ার একটি বিখ্যাত স্থান। যা মূলত একটি সুপ্রাচীন বৌদ্ধবিহার।

অবস্থান : পাহাড়পুর বিহারটি বর্তমান রাজশাহী বিভাগের নওগাঁ জেলার বদলগাছি উপজেলার 'পাহাড়পুর' গ্রামে অবস্থিত। এর আরেক নাম 'সোমপুর বিহার' বা 'সোমপুর মহাবিহার'।

আবিষ্কারের ইতিহাস : আজ থেকে প্রায় ১৪শ বছর আগে বিহারটি নির্মাণ করা হয়। রাজা দ্বিতীয় ধর্মপাল এটি নির্মাণ করিয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে দীর্ঘ সময় এটি খালি পড়ে থাকে। অর্থাৎ কোনো কাজে ব্যবহৃত হয়নি। অনেকে মনে করেন, যুগ যুগ ধরে উড়ে আসা ধুলোবালি ও মাটি এর চারদিকে জমতে থাকার কারণে এক সময় মাটির স্তূপে ঢাকা পড়ে এটি পাহাড়ের মতো হয়ে যায়। সেই থেকে এর নাম হয়ে যায় 'পাহাড়পুর'। দীর্ঘকাল পরে ১৮৭৯ সালে আলেকজান্ডার কানিংহাম এটি আবিষ্কার করেন।

নির্মাণশৈলী ও বিবরণ : সুপ্রাচীন এ বিহার এলাকাটি প্রায় ৪০ একর জায়গা জুড়ে লালচে মাটির ভূমিতে বিস্তৃত। ২৭ একর জমির ওপর এর বিশাল দালান। মাটির নিচের অংশে এটি চারকোণা আকারের। বাইরের দেয়ালের গায়ে পোড়ামাটি দিয়ে নানা রকম ফুল-ফল, পাখি, পুতুল, মূর্তি ইত্যাদি বানানো আছে। উত্তর দিকের ঠিক মাঝখানে মূল দরজা। তারপরেই রয়েছে অনেকগুলো ছোট–বড় হলঘর। দেয়ালের ভেতরে সুন্দর সার বাঁধা ১৭৭টি ছোট ছোট ঘর। সামনের দিকে আছে লম্বা বারান্দা। বিহারটিতে আরও আছে পুকুর, স্নানঘাট, কূপ, স্নানঘর, রান্নাঘর, খাবার ঘর ও টয়লেট। সব মিলিয়ে বিহারটিতে ৮০০ মানুষের থাকার ব্যবস্থা ছিল।

অন্যান্য দর্শনীয় স্থাপনা : বিহারের ভিতর বিশাল উঠানের মাঝখানে বড় এক সুন্দর মন্দির। ধাপে ধাপে উঁচু করে বড় মন্দিরটা বসানো হয়েছে। পোড়ামাটির দুই হাজার ফলকের চিত্র দিয়ে মন্দিরের বাইরে আর ভেতরে সাজানো। একই রকম ছোটছোট মন্দির পুরো বিহারের নানান জায়গায় আছে। বিহারটির পূর্ব-দৰিণ কোণে দেয়ালের বাইরে একটা বাঁধানো ঘাট আছে। ওটাকে বলা হয় 'সন্ধ্যাবতীর ঘাট'। পাহাড়পুর বিহারের পাশে আছে

দেখার মতো একটা জাদুঘর। সেখানে সুন্দর করে সাজিয়ে রাখা আছে খনন করে পাওয়া অনেক পুরাতন আর দুর্লভ জিনিসপত্র। এই এলাকার একটু দূরেই আছে 'সত্যপীরের ভিটা'। সেখানে অনেকেই ভক্তিভরে প্রার্থনা করে, মানত করে।

গুরুত্ব : বাংলার ধর্মীয় ইতিহাসে পাহাড়পুর এক বিশেষ স্থান দখল করে আছে। এটি ছিল বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের উচ্চশিক্ষার প্রাণকেন্দ্র। এখানে প্রাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলো থেকে প্রাচীন বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

উপসংহার : পাহাড়পুর বিহারের প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব অনেক। আমাদের সকলেরই উচিত একবারের জন্য হলেও পাহাড়পুর ঘুরে আসা।

২২ মা

অথবা, আমার মা

অথবা, আমার প্রিয় ব্যক্তিত্ব

সূচনা : 'হেরিলে মায়ের মুখ,
দূরে যায় সব দুখ।'

আমাদের সবার জীবনে 'মা' একটি মধুমাখা নাম। পৃথিবীতে তিনিই সন্তানের সবচেয়ে আপনজন। আমিও আমার মাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি।

সন্তানের প্রতি মায়ের ভালোবাসা : পৃথিবীতে মায়ের কাছে সবচেয়ে দামি তাঁর সন্তান। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর সকল ভাবনা সন্তানদের নিয়ে। সন্তান কিসে ভালো থাকবে, নিরাপদ থাকবে– তিনি সবসময় কেবল সে ভাবনাই ভাবেন। মায়ের আশিস পেলে সন্তানের দুঃখ দূর হয়। মায়ের মমতা আমাদের চলার পথের পাথেয়।

আমার মা : আমার মা আমাকে অনেক স্নেহ করেন। সবসময় কাছে কাছে রাখেন। আমার অসুখ করলে মায়ের দুশ্চিন্তার শেষ থাকে না। রাত–দিন জেগে তিনি আমার সেবা করেন। আমার খুশির জন্য যা যা করা দরকার তার সবই মা করেন।

বন্ধু হিসেবে মা : মা আমার শ্রেষ্ঠ বন্ধু। আমি মায়ের কাছে কোনো কিছুই গোপন করি না। তিনি আমার সব ভালো কাজে উৎসাহ দেন। মন্দ কাজ করলে বুঝিয়ে বলেন। কখনোই বকুনি দেন না। মায়ের কাছেই আমার যত আবদার।

অভিভাবক হিসেবে মা : মা আমাকে মানুষের মতো মানুষ হতে বলেন। তিনি আমার সেরা শিক্ষক। আমার পড়া তৈরিতে মা সাহায্য করেন। কঠিন বিষয়গুলো মা খুব সহজেই বুঝিয়ে দেন।

উপসংহার : মা-ই আমার সবচেয়ে কাছের মানুষ। আমি মা-কে কষ্ট দিই না। নানা কাজে তাঁকে সাহায্য করি। সবসময় তাঁর কথামতো চলতে চেষ্টা করি।

২৩ আমার প্রিয় শিক্ষক

সূচনা : ছাত্রজীবনে যারা আমাদের শিক্ষাদানের মাধ্যমে আলোর পথ দেখান তাঁরাই আমাদের শিক্ষক। বিশেষ কিছু গুণের কারণে কোনো কোনো শিক্ষক আমাদের মনে আলাদাভাবে স্থান করে নেন। হয়ে ওঠেন আমাদের প্রিয় শিক্ষক, প্রিয় মানুষ। আমারও তেমনি একজন প্রিয় শিক্ষক আছেন।

আমার প্রিয় শিক্ষক : আমার সবচেয়ে প্রিয় শিক্ষকের নাম খন্দকার আকরাম হোসেন। স্কুলে তিনি আকরাম স্যার নামে সবার কাছে পরিচিত। তাঁর সততা, নিষ্ঠা ও ব্যক্তিত্ব তাঁকে সবার কাছে অনুসরণীয় করে তুলেছে।

প্রিয় হওয়ার কারণ : আকরাম স্যার আমাদের গণিত পড়ান। গণিতে আমি খুব দুর্বল ছিলাম। গণিত পরীক্ষার আগের দিন ভয়ে কাঁপতাম। আকরাম স্যারের ক্লাস করার পর থেকে সে সমস্যা কেটে গেছে। এটি ছাড়াও ছাত্রদের সাথে তিনি সেভাবে খোলামন নিয়ে মেশেন সেটিও আমাকে আকৃষ্ট করে।

পাঠদান পদ্ধতি : আকরাম স্যারের পাঠদান পদ্ধতি খুবই চমৎকার। তিনি কখনই দেরি করে ক্লাসে আসেন না। খুব সুন্দরভাবে ছাত্রদের অংকগুলো বুঝিয়ে দেন। কে কতখানি বুঝতে পারল সেটিও যাচাই করেন। কেউ না বুঝলে তাকে বকা দেন না। বোঝানোর ক্ষেত্রে নানা ধরনের উদাহরণ ব্যবহার করেন।

চারিত্রিক গুণাবলি : আকরাম স্যার খুব নম্র ও ভদ্র মানুষ। তাঁকে কখনোই রাগতে দেখা যায় না। কাউকে কোনো কাজ দেওয়ার আগে কীভাবে করতে হবে তা ভালোভাবে বুঝিয়ে দেন। ছাত্রছাত্রীদের তিনি নিজের সন্তানের মতোই স্নেহ করেন। এককথায়, একজন ভালো শিক্ষক ও ভালো মানুষ হওয়ার জন্য যেসব গুণ থাকা প্রয়োজন, তার সবই তাঁর চরিত্রে রয়েছে।

উপসংহার : আকরাম স্যারকে আমি মন থেকে অনেক শ্রদ্ধা করি ও ভালোবাসি। তাঁকে অনুসরণ করে আমি নিজেকে একজন আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে চাই।

২৪ আমার প্রিয় বই

সূচনা : বই হচ্ছে জ্ঞানের ভান্ডার। বইয়ের পাতায় অনেক সুন্দর চিন্তা–ভাবনার কথা বলা থাকে। বই পড়ে আমরা স্বপ্ন দেখতে শিখি। একটি ভালো বই পাঠকের মনে স্থায়ী একটা ছাপ রেখে যায়। বারবার সে বইটি পড়তে ইচ্ছে করে। আমারও তেমনি একটি পছন্দের বই আছে।

আমার প্রিয় বই : আমার প্রিয় বইয়ের নাম 'কাকের নাম সাবানি' বইটির লেখক হচ্ছেন বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক আনিসুল হক।

বইয়ের কাহিনী : বইটির কাহিনী আবর্তিত হয়েছে সাবানি নামক একটি কাককে ঘিরে। সাবান খেতে ভালোবাসে বলে তার নাম সাবানি বেগম। সাবানির স্বপ্ন সে বড় একজন শিল্পী হবে। সেই লব্যে মফস্বলের মায়া কাটিয়ে ঢাকার উদ্দেশ্য উড়াল দেয় সে। সেই ভ্রমণের বিবরণ আর সাবানির জীবনের নানা অভিজ্ঞতায় পরিপূর্ণ বইটি।

ভালো লাগার কারণ : কিছু বই আছে যেগুলো পড়লে আনন্দ পাওয়ার পাশাপাশি অনেক কিছু শেখা যায়। 'কাকের নাম সাবানি' ঠিক তেমনই একটি বই। এ বইয়ের কাহিনীটি অসাধারণ। আর কাহিনীর ভেতরেই রয়েছে শেখার মতো অনেক উপাদান। সাবানি আর তার বন্ধু কোকিলের মধ্যকার ভালোবাসা আমাকে সত্যিকারের বন্ধুত্ব সম্পর্কে ধারণা দিয়েছে। 'মধুকণ্ঠী' নামক কোকিলটি মারা গেলে সাবানি খুব দুঃখ পায়। তার কষ্টের কথা পড়ে আমারও কান্না পেয়ে গিয়েছিল। শিল্পী হওয়ার স্বপ্ন সত্যি করার জন্য সাবানিকে অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছিল। তার ডানা কাটা পড়েছিল, এমনকি জেলেও যেতে হয়েছিল তাকে। তারপরও প্রবল আত্মবিশ্বাসের জোরে সাবানি একসময় সফল হয়। শ্রেষ্ঠ শিল্পী হিসেবে পুরস্কারও পায়। একতাবদ্ধ হওয়ার গুরবত্ব, পরোপকার, লোভ না করা ইত্যাদি অনেক কিছুই লেখক এই বইটিতে গল্পচ্ছলে উলেরখ করেছেন। গল্পে সাবানি বেগমের মজার সব কান্ডকারখানাও আমাকে প্রচন্ড আকর্ষণ করেছে। এসব কারণেই বইটি আমার এত ভালো লেগেছে।

উপসংহার : 'কাকের নাম সাবানি' বইটি একবার পড়া ধরলে শেষ না করে ওঠা যায় না। কয়েক বার পড়া হয়ে গেলেও আমার ইচ্ছা হয় বইটি আবার পড়ি। বইটি আমাকে অপরিসীম আনন্দ দিয়েছে।

২৫ ফুটবল খেলা

অথবা, আমার প্রিয় খেলা

ভূমিকা : ফুটবল অত্যন্ত চমৎকার একটি উত্তেজনাপূর্ণ খেলা। এ খেলার সূচনা হয় চীনে। বর্তমানে সারা বিশ্বে এ খেলাটি তুমুল জনপ্রিয়। আমার প্রিয় খেলাও ফুটবল।

ফুটবল মাঠের বর্ণনা : একটি সমতল মাঠে ফুটবল খেলা হয়। মাঠের চারদিক সীমারেখা দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। লম্বালম্বি দু বিপরীত প্রান্তে দুটি গোলপোস্ট থাকে।

খেলার বর্ণনা : একটি বল মাঠের মাঝামাঝি স্থাপন করা হয়। দুটি দলের মধ্যে খেলা অনুষ্ঠিত হয়। প্রত্যেক দলে ১১ জন করে খেলোয়াড় থাকে। গোলপোস্ট পাহারায় থাকে একজন করে গোলরবক। মাঝের দশ মিনিট বিরতি ছাড়া ৪৫ মিনিট করে মোট ৯০ মিনিট খেলা হয়। সময় শেষে যে দল গোল ব্যবধানে এগিয়ে থাকে তারাই জয়ী হয়।

পরিচালক : যিনি ফুটবল খেলা পরিচালনা করেন তাঁকে বলা হয় রেফারি। খেলার সকল ব্যাপারে তাঁর সিন্ধান্তই চূড়ান্ত। তাঁর নির্দেশে খেলা আরম্ভ এবং শেষ হয়। কোনো খেলোয়াড় নিয়ম ভঙ্গ করলে রেফারি বাঁশি বাজিয়ে তাঁর নির্দেশ প্রদান করেন। মাঠের দুপাশে দুজন লাইন্সম্যান তাঁর কাজে সাহায্য করেন।

খেলার নিয়মকানুন : ফুটবল খেলার কতকগুলো নিয়ম আছে। গোলরবক ছাড়া অন্য কেউ হাত দিয়ে বল ধরলে 'হ্যান্ড বল' ধরা হয়। বল সীমানার বাইরে চলে গেলে 'আউট' ধরা হয়। অন্যপবের খেলোয়াড়কে অহেতুক ধাক্কা দিলে বা পা লাগিয়ে ফেলে দিলে 'ফাউল' ধরা হয়। কোনো পব নিজ গোলপোস্টের সীমানায় হ্যান্ডবল করলে বা প্রতিপবের খেলোয়াড়কে ফাউল করলে 'পেনাল্টি' দেওয়া হয়। আর প্রতিপবের আক্রমণ প্রতিহত করতে গিয়ে বল যদি নিজ গোলপোস্টের পার্শ্ব সীমানার বাইরে চলে যায় তবে অপরপব 'কর্নার' লাভ করে। বল গোলপোস্টে প্রবেশ করলে সেটিকে গোল হিসেবে ধরা হয়।

উপকারিতা : ফুটবল খেলা বেশ আনন্দদায়ক। এ খেলা স্বাস্থ্যের পবে উপকারী। এতে দেহের সকল অংশ উত্তমরূ পে পরিচালত হয় বলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ সবল ও দৃঢ় হয়। খেলোয়াড়দের কতগুলো নিয়মের অধীনে খেলতে হয় বলে তারা নিয়মানুবর্তিতা, কর্মতৎপরতা এবং একতাবদ্ধ হয়ে কাজ করার শিবা লাভ করে।

উপসংহার : ফুটবল খুবই আনন্দময় ও উপকারী খেলা। এ খেলা খেলোয়াড় ও দর্শক উভয়ের উত্তেজনা বাড়ায়। যে কোনো বয়সী মানুষের জন্য এটি একটি ভালো ব্যায়াম। এ খেলা সহযোগিতা ও শৃঙ্খলাবোধ শিবা দেয়। তাই ফুটবল আমার সবচেয়ে প্রিয় খেলা।

২৬ আমার জীবনের লক্ষ্য

সূচনা : একটি সফল ও সার্থক জীবন পাওয়ার অন্যতম পূর্বশর্ত হচ্ছে জীবনের লব্য নির্ধারণ। মানুষের জীবন ছোট কিন্তু তার কর্মবেত্র অনেক বড়। এ ছোট জীবনে উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করতে হলে প্রত্যেক মানুষকে জীবনের শুরবতেই সঠিক লব্য নির্ধারণ করতে হয়।

লক্ষ্য নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তা : জীবন গঠনের জন্য জীবনের একটি নির্দিষ্ট লব্য নির্ধারণ অত্যন্ত জরবরি। লব্যহীন জীবন হলো হালবিহীন নৌকার মতো। তাই লব্যস্থির না করলে সফলতা পাওয়া অসম্ভব। প্রতিটি মানুষকে জীবনের শুরবতে সঠিক চিন্তা ভাবনা করে লব্য ঠিক করে সেটাকে বাস্তবায়নের চেষ্টা করতে হবে।

আমার জীবনের লক্ষ্য : আমি সপ্তম শ্রেণির ছাত্র। আমার ইচ্ছা বড় হয়ে আমি একজন ক্রিকেটার হব।

লক্ষ্য নির্ধারণের কারণ : সাধারণত মানুষের জীবনের লৰ্য থাকে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিৰক ইত্যাদি হওয়া। কিন্তু মানুষের যে কাজটি ভালো লাগে সেটির চর্চা অব্যাহত রাখলেই বেশি সফলতা পাওয়া যায়। ক্রিকেট খেলার প্রতি আমার ভালোলাগা অত্যন্ত প্রবল। ক্রিকেটারদের দেশপ্রেম, মনোবল ও সুশৃঙ্খল জীবন আমাকে অত্যন্ত আকর্ষণ করে। একারণেই আমি ক্রিকেটার হওয়ার লৰ্য ঠিক করেছি। তাছাড়া বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলা ক্রিকেট। ক্রিকেটে বাংলাদেশেরও একটি শক্ত অবস্থান তৈরি হয়েছে। তাই বাংলাদেশের ছেলেমেয়েরা এখন ক্রিকেটার হওয়ার স্বপ্ন দেখতেই পারে।

লক্ষ্য পূরণে করণীয় : জীবনের লৰ্য পূরণে আমাকে এখন থেকেই মনোযোগী হতে হবে। শুধু ভালো ক্রিকেট খেললেই ভালো ক্রিকেটার হওয়া যায়। সেই সাথে পড়াশোনায়ও ভালো হওয়া প্রয়োজন। তাহলেই ক্রিকেটের সব আধুনিক দিকগুলো ঠিকঠাক বুঝতে পারব। এখন থেকেই ক্রিকেটের সব খুঁটিনাটির বিষয়ে আমাকে জানতে হবে। নিয়মিত অনুশীলন করতে হবে।

উপসংহার : বাংলাদেশের ক্রিকেট অত্যন্ত সম্ভাবনাময়। একজন আদর্শ ক্রিকেটার হয়ে আমি সে সম্ভাবনাকে সত্যে পরিণত করতে চাই। দেশের জন্য সুনাম বয়ে আনতে চাই।

২৭ ছাত্রজীবন

অথবা, ছাত্রজীবনের দায়িত্ব ও কর্তব্য

সূচনা : বিদ্যাশিৰার জন্য শিশুকাল থেকে শুরব করে যে সময়টুকু আমরা শিৰা প্রতিষ্ঠানে অতিবাহিত করি তাকেই ছাত্রজীবন বলে। ছাত্রজীবন হচ্ছে জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সময়। ভবিষ্যত জীবনের সফলতার জন্য এ সময় থেকেই প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হয়।

ছাত্রজীবনের গুরুত্ব : ভবিষ্যৎ জীবনের সুখ, সমৃদ্ধি ও উন্নতির বীজ ছাত্রজীবনেই বপন করতে হয়। ছাত্রজীবনের সুশিৰাই ভবিষ্যৎ জীবনের পাথেয়। আমাদের জীবনে আত্মপ্রতিষ্ঠা ছাত্রজীবনের সাধনার ওপর সম্পূর্ণরূ পে নির্ভরশীল।

ছাত্রজীবনের কর্তব্য : অধ্যায়ন করাই ছাত্রজীবনের প্রথম ও প্রধান তপস্যা। ছাত্রসমাজই দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ কর্ণধার। এজন্য ছাত্রদের অন্যতম কাজ হলো শিৰা-দীৰায় সমৃদ্ধ ও আদর্শ জীবন গঠন করা। ছাত্রসমাজকে জ্ঞান–বিজ্ঞানে উন্নত এবং শারীরিক শক্তিতে ও মানসিক দৰতায় বলীয়ান হতে হবে। যোগ্যতাসম্মন্ন ও চরিত্রবান ছাত্রদের জাতি গঠনে আত্মনিয়োগ করতে হবে।

লক্ষ্য নির্ধারণ : লৰ্যহীন জীবন হালবিহীন জাহাজের মতো। ছাত্রজীবনেই জীবনের লৰ্য স্থির করতে হবে এবং সে অনুযায়ী প্রস্তুতি নিতে হবে।

চরিত্র গঠন : চরিত্র মানবজীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। ছাত্রজীবনই চরিত্র গঠনের উপযুক্ত সময়। ছাত্রদের চরিত্র গঠনে বিশেষ মনোযোগী হতে হবে। সৎ পথে চলা, সত্য কথা বলা, লোভ-লালসা থেকে বিরত থাকা, খারাপ কাজ ও কুসঙ্গ থেকে দূরে থাকা, ছোটদের স্নেহ করা ও বড়দের শ্রদ্ধা করা ইত্যাদি ভালো গুণগুলো ছাত্রজীবনেই চর্চা করতে হবে।

খেলাধুলা ও স্বাস্থ্য গঠন : পড়াশোনার পাশাপাশি শরীর গঠনের প্রতিও ছাত্রদের মনোযোগী হতে হবে। স্বাস্থ্য মানবজীবনের অমূল্য সম্পদ। সুস্থ শরীরেই সুস্থ মনের বাস। তাই ছাত্রজীবনে নিয়মিত খেলাধুলার মাধ্যমে স্বাস্থ্য গঠনে সচেষ্ট হতে হবে।

সৃজনশীল কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ : ছাত্রদের মানসিক বিকাশে সৃজনশীল কর্মকাণ্ডে অংশ নেওয়া অত্যন্ত জরবরি।এৰেত্রে যার যে কাজ ভালো লাগে সে কাজে মনোযোগ দিতে হবে। বিতর্ক চর্চা, আবৃত্তি চর্চা, বই পড়া, ভ্রমণ, ছবি তোলা, বিজ্ঞান চর্চা, লেখালেখি ইত্যাদির মাধ্যমে নিজের বুদ্ধিবৃত্তিকে আরও তীক্ষ্ম করে তোলা সম্ভব।

জনসেবামূলক কাজে অংশগ্রহণ : ছাত্ররাই দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ। তাই ছাত্রজীবনে সকলের উচিত জনসেবামূলক কাজে অংশগ্রহণ করা। বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগে ৰতিগ্রস্থদের সাহায্য–সহযোগিতায় এগিয়ে আসা ছাত্রদের কর্তব্য।

উপসংহার : ছাত্রজীবনই জীবনের সবেচেয় গুরবত্বপূর্ণ সময়। তাই এ সময় থেকেই ছাত্রদের নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠতে হবে। ছাত্ররাই ভবিষ্যতে দেশের সকল ৰেত্রে নেতৃত্ব দিবে। তাই নিজেদের উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে পারলেই দেশ ও জাতির জন্য তারা গৌরব বয়ে আনতে সৰম হবে।

২৮ মানুষের বন্ধু গাছপালা

অথবা, বৃৰরোপণ অভিযান

অথবা, গাছ লাগান-পরিবেশ বাঁচান

সূচনা : বৃৰ বা গাছপালা মানুষের অকৃত্রিম ও চিরস্থায়ী বন্ধু। মানব জাতির সামগ্রিক কল্যাণ ও প্রাকৃতিক ভারসাম্য রৰায় বৃৰের অবদান অসামান্য। এ ব্যাপারে সমগ্র বিশ্বই আজ সচেতন। বৃৰরোপণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে আমাদের দেশেও স্লোগান উঠেছে, 'গাছ লাগান-পরিবেশ বাঁচান'।

বৃক্ষের প্রয়োজনীয়তা : আমাদের দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটাতে গাছের মতো অবদান আর কারও নেই। গাছ থেকেই আমরা পাই জীবনধারনের জন্য খাদ্য, বস্ত্র তৈরির তুলা, বাসগৃহ ও আসবাবপত্র নির্মাণের প্রয়োজনীয় কাঠ ইত্যাদি। বৃৰ আমাদের বেঁচে থাকার জন্য অপরিহার্য অক্সিজেন দেয় এবং বিষাক্ত কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে। বৃৰ থেকে আমাদের জীবনরৰাকারী

নানারকম ওষুধ তৈরি হয়। গাছপালা প্রাকৃতিক ভারসাম্য রৰা করে পৃথিবীকে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে বাঁচায়।

বাংলাদেশের বনাঞ্চল : একটি দেশের প্রাকৃতিক ভারসাম্য রৰার জন্যে দেশের মোট আয়তনের শতকরা ২৫ ভাগ বনভূমি থাকা আবশ্যক। কিন্তু বাংলাদেশে বনভূমি আছে মাত্র ১৭ ভাগ। যেটুকু রয়েছে তাও দ্রবতগতিতে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। অসাধু ব্যবসায়ী এবং লোভী বন কর্মকর্তা-কর্মচারীরা প্রাকৃতিক সম্পদ ধ্বংসের জন্য দায়ী।

বৃক্ষরোপণ অভিযান : গাছ না লাগিয়ে যদি কেবল কেটে ফেলা হয় তাহলে প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হবে এবং পৃথিবীতে প্রাণের অস্তিত্ব হুমকির সম্মুখীন হবে। এজন্য বৃৰরোপণে সমাজের সকল স্তরের লোকজনকে উৎসাহিত করতে হবে।

আমাদের করণীয় : বৃৰরোপণ অভিযান সফল করার জন্যে সরকারের পাশাপাশি জনগণকেও এগিয়ে আসতে হবে। বাড়ির আশেপাশে খালি জায়গাগুলোতে যথাসাধ্য গাছ লাগাতে হবে। বড়দের পাশাপাশি শিশুদের এ ব্যাপারে এখন থেকেই সচেতন করে তুলতে হবে। একটি গাছ কাটার প্রয়োজন হলে আগে কমপৰে দুটি গাছ লাগাতে হবে।

উপসংহার : মানুষ ও প্রাণীকুলের সুরৰিত ভবিষ্যত নিশ্চিত করার জন্যে বৃৰরোপণ অভিযান অত্যন্ত জরবরি একটি পদৰেপ। এ অভিযান সফল হলে আমাদের জীবন সমৃদ্ধ হবে। দেশ ভরে উঠবে সবুজের প্রশান্তিতে।

২৯ বিজ্ঞানের অবদান

অথবা, দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞান

সূচনা : বর্তমান যুগ বিজ্ঞানের যুগ। আজ বিজ্ঞান আমাদের কাছে নিশ্বাস-প্রশ্বাসের মতোই অপরিহার্য। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে একটা মুহূর্তও বিজ্ঞানের সাহায্য ছাড়া আমরা চলতে পারি না। এখন যে-কোনো ধরনের জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত মানুষই বিজ্ঞানের উপর নির্ভরশীল। সকালে ঘুম থেকে উঠে রাতে ঘুমাতে যাওয়া পর্যন্ত যাবতীয় কাজকর্মের মধ্যে বিজ্ঞানের অবদান লৰণীয়। বলা যায়, এখন বিজ্ঞানই মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের নিয়ন্ত্রক।

দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞান : বিজ্ঞানকে বাদ দিয়ে মানুষের একটি মুহূর্তও কল্পনা করা যায় না। এখন প্রতি মুহূর্তে, প্রতি পদৰেপে সভ্য-মানুষ বিজ্ঞানের সাহায্য নিয়ে জীবন-ধারণ করছে। এই যে বসে লিখছি- হাতের কলম ও কালি, লেখার কাগজ, এমনকি বসার জায়গাটিতে পর্যন্ত বিজ্ঞানের প্রভাব রয়েছে। আমাদের পথে-

ঘাটে, অফিস-আদালতে, স্কুল-কলেজে সব জায়গায়ই বিজ্ঞানের অবদান অসীম। শুধু তাই নয়, আমাদের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানের এই প্রাথমিক প্রয়োজনটুকুও বিজ্ঞান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রায় প্রতিটি কাজেই আমরা বিজ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল।

শহুরে জীবনে বিজ্ঞান : শহুরে জীবনে মানুষ আর বিজ্ঞান অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। শহরে আমাদের ঘুম ভাঙে এলার্মঘড়ির শব্দে। ঘুম থেকে উঠে দিনের শুরু করি টুথপেস্ট আর টুথব্রাশ দিয়ে। এরপর আছে সংবাদপত্র। তারপর গ্যাস অথবা হিটার কিংবা স্টোভে তাড়াতাড়ি রান্না করে খাই। রিক্সা, অটোরিক্সা, বাস, ট্রেন বা মোটরসাইকেলে চড়ে কর্মস্থলে পৌঁছাই। সিঁড়ির বদলে লিফটে উঠে শ্রেণিকৰে বা অফিসকৰে যাই। টেলিফোন, টেলিগ্রাম, ফ্যাক্স, ই-মেইল, ইন্টারনেট ইত্যাদির সাহায্যে দূর-দূরান্তে খবর পাঠাই। কম্পিউটারে কাজের বিষয় লিখে রাখি। ক্লান্ত দেহটাকে আরাম দেওয়ার জন্য এসি কিংবা ইলেকট্রিক পাখার নিচে বসি- এই ভাবেই সারাদিন বিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা জীবন চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। আবার সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে দিনের অবসন্নতা দূর করতে মিউজিক পেরয়ার কিংবা টিভি চালিয়ে মনটাকে সতেজ রাখতে চেষ্টা করি। ছেলে-মেয়েরা কম্পিউটারে তাদের নোট রাখে; কখনো কখনো ভিডিও গেমস্ খেলে। এমনিভাবে জীবনের প্রতি পদৰেপেই বিজ্ঞানের অবদান অনুভব করি।

গ্রামীণ জীবনে বিজ্ঞান : যোগাযোগ ও যাতায়াতের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের বিস্ময়কর অবদানের জন্য মানুষ আজ দূরকে করেছে নিকট প্রতিবেশী। বাস, রিক্সা, ভ্যান, সাইকেল, মোটরসাইকেল সবই এখন গ্রামীণ জীবনের অংশ। ফলে বিজ্ঞান শহরজীবনকে অতিক্রম করে পৌঁছে গেছে গ্রামে। বর্তমানে গ্রাম্য জীবনেও বিজ্ঞানের উপর নির্ভরতা বেড়েই চলেছে। টিভি, রেডিও, মোবাইল ফোন, টর্চ, রাসায়নিক সার, কীটনাশক দ্রব্য, ট্রাক্টর ইত্যাদি এখন গ্রামীণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে মিশে গেছে। শহরের মানুষ যেমন নিজেদের জীবনযাত্রাকে সহজ করতে বিজ্ঞানকে নিত্যসঙ্গী করেছে, তেমনি গ্রামের মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত মানুষের জীবনেও ইলেকট্রিক হিটার, রান্নার গ্যাস, প্রেসার কুকার, ফ্রিজ, ওয়াশিং মেশিন ইত্যাদি অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।

দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞানের প্রভাবের অপকারিতা : দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞানের উপর অতিমাত্রায় নির্ভরতা মানুষের অনেক ক্ষতি করেছে। যন্ত্রের উপর অতিরিক্ত নির্ভর করতে গিয়ে মানুষ পরিশ্রম-বিমুখ হয়ে উঠছে। মানসিক পরিশ্রমের তুলনায় শারীরিক পরিশ্রম কম করছে। ফলে মানুষ নানা জটিল রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। সবচেয়ে বড় কথা, মানুষের জীবনে কৃত্রিমতা ঘনীভূত হচ্ছে। মানুষের স্নেহ, মায়া, মমতার মতো সদগুণগুলো হারিয়ে যাচ্ছে। মানুষে মানুষে বিভেদ বাড়ছে। বিজ্ঞান-নির্ভর যন্ত্রশক্তির উপর অন্ধ আস্থা স্থাপন করতে গিয়ে মানুষ যান্ত্রিক হয়ে উঠছে।

উপসংহার : আমাদের দৈনন্দিন জীবনের নানা প্রয়োজনীয় বস্তু আজ একেবারে হাতের মুঠোয় এনে দিয়েছে বিজ্ঞান। সকাল থেকে সন্ধ্যা, আবার সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত যা কিছু আমাদের প্রয়োজনীয় তার সবই বিজ্ঞানের অবদান। বিজ্ঞান আজ আমাদের নিত্য সহচর। বিজ্ঞান আমাদের জীবন-যাপনকে করেছে সহজসরল। তবে দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞানের প্রভাব শুধু যে কল্যাণ করছে তা নয়, অনেক ক্ষতিও করছে। তাই বিজ্ঞানের অপব্যবহার না করে আমাদের আরো সচেতন হতে হবে।

—: সমাপ্ত :—